বিজ্ঞান

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal as a text book for Class VIII of all the H. E. Schools. (Notification No. Syl./20, Calcutta, the 31st March '53, Vide Calcutta Gazette, April 9, 1953 and Notification No. Syl./37, Calcutta, the 1st October, 1953, Vide Calcutta Gazette, October, 29, 1953.

বিজ্ঞান

তৃতীয় ভাগ

(অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক

ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এম্. এস. সি., ডি. ফিল্.

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড

১, শঙ্কর ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিজ্ঞান

তৃতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবদেহের সাধারণ জ্ঞান

দেহের উপাদান

মানবদেহ শক্ত হাড়ের কাঠামোর উপর নরম মাংসপেশী, চর্বি ও সবার উপর ত্বক্ বা চামড়ার আবরণে ঢাকা থাকে। কাঠামো হইতে নরম মাংসপেশীগুলি যাহাতে খুলিয়া না যায় সেইজন্য সেগুলি দড়ির মত কণ্ডরা দিয়া বিভিন্ন হাড়ের সহিত আটকান। হাড়ের পর হাড় জুড়িয়া যে কাঠামোটি গঠিত হয় তাহা যাহাতে সহজে ভাঙ্গিয়া না যায় সেইজন্য ইহারা পরস্পরের সহিত বিভিন্নরূপে যুক্ত। ইহা ছাড়া অস্থিবন্ধনী বলিয়া এক প্রকার দড়ির মত বস্তু দিয়াও হাড়গুলি অনেক জায়গায় পরস্পরের সহিত আটকান থাকে। নরদেহের কাঠামোটিকে বলা হয় নরকঙ্কাল। ইহা দেহকে খাড়া থাকিতে সাহায্য করে এবং দরকারী যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করে। মানব দেহে দেখা, শোনা, চিন্তা করা, বোঝা, খাওয়া, পুষ্টিগ্রহণ করা, শ্বাসকার্য সম্পাদন ও দূষিত পদার্থ ত্যাগ করা প্রভৃতি নানা কার্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র আছে। বাহির হইতে মাথা, ধড়, হাত ও পা এই চারটি অংশ বোঝা যায়—বুক ও পেটের তফাৎ বোঝা যায় না। দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে কিন্তু দেখা যায় যে, মধ্যচ্ছদা বলিয়া একটি মাংসপেশী দ্বারা গঠিত পর্দা বুক ও পেটকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে।

দেহের প্রতিটি অংশ যে উপাদানে গঠিত তাহার নাম টিস্থ। প্রতিটি টিস্থ কতকগুলি একই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট ছোট ছোট কুঠ্ রির মত জীবন্ত কোষের দ্বারা নির্মিত। এই কোষগুলি এত ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া তাহাদের দেখা সম্ভবপর নহে।

একই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার টিস্থদ্বারা দেহের বিভিন্ন যন্ত্র, এবং একই কার্য করিবার জন্য বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির যন্ত্রের সমষ্টির দ্বারা বিভিন্ন যন্ত্রমণ্ডলী বা তন্ত্র গঠিত হয়। মানবদেহ পর্যবেক্ষণ ও ব্যবচ্ছেদ করিলে ত্বক্ বা চামড়া, মেদ বা চর্বি, মাংসপেশী ও নরকঙ্কাল বাদে পাচনতন্ত্র, রক্ত-সঞ্চালনতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, রেচন বা দেহমল নিঃস্রাবীতন্ত্র, জননতন্ত্র, রসস্রাবীতন্ত্র, ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াবলী দেখা যায়। শেষের গুলির ভিতর চোখ, কান, নাক, জিভ ও চামড়ার স্পর্শকোরকগুলি প্রধান। এইগুলির দ্বারা দেখা, শোনা, শোঁকা, স্বাদ নেওয়া, স্পর্শ করা প্রভৃতি কাজ হইয়া থাকে।

ত্বক্, নখ ও কেশ

দেহের আবরণটিকে ত্বক্ বা চামড়া বলা হয়। ইহার দুইটি অংশ—উপরের উপচর্ম ও ভিতরের প্রকৃতচর্ম। উপচর্মকে চলতি কথায় নুন-ছাল বলা হয়। ইহাতে কোন শিরা, ধমনী ও নার্ভ নাই, সেইজন্য সেলাই করিতে করিতে ছুঁচ ফুটিয়া গেলে বা কাঁটা ফুটিলে রক্ত পড়ে না, বেদনাও হয় না। আমাদের শরীরে যে ফোস্কা পড়ে বা ঘামাচি হয় তাহা এই উপচর্মেই হয়। ক্রমাগত ঘসা লাগিয়া বা শক্ত জিনিষের সংস্পর্শে আসিয়া উপচর্ম পুরু ও শক্ত হইয়া গেলে তাহাকে কড়াপড়া বলা হয়। নখ ও কেশ উপচর্মেরই রূপান্তর। এইগুলি ব্যতীত দেহের ঘাম যে স্থানে তৈয়ারী হয় সেই ঘর্মগ্রন্থি, একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ নিঃস্রাবী স্নেহগ্রন্থি, এবং স্তনের দুগ্ধগ্রন্থিগুলিও উপচর্ম দ্বারা গঠিত।

চর্মের ভিতরের স্তর বা প্রকৃতচর্মে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা, ধমনী, নার্ভ, মাংসপেশী, মেদ প্রভৃতি থাকে। চুল, ঘর্মগ্রন্থি, স্নেহগ্রন্থি, দুগ্ধগ্রন্থি প্রভৃতি

উপচর্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহারা এই অংশে থাকে। এই স্তরে ছোট ছোট স্পর্শকোরক থাকে। ঐগুলি দ্বারা স্পর্শবোধ জন্মায়।

ত্বকের কার্য প্রধানতঃ দুইটি—দেহকে আচ্ছাদিত করা ও শরীরের খানিকটা দূষিত পদার্থ ঘামের সহিত বাহির করিয়া দেওয়া। ইহা ছাড়াও স্পর্শকোরক ও নার্ভ থাকায় চর্মের দ্বারা আমরা বাহ্যবস্তুর স্পর্শ অনুভব করি। রক্তবাহী নালী, মেদ ও কেশ থাকায় ত্বক্ দেহের উত্তাপের সমতা রক্ষা করে। স্নেহগ্রন্থি হইতে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া দেহের রুক্ষতা নষ্ট করে।

মেদ

চামড়ার তলায় এবং মাংসপেশীর উপর সাদা বা ঈষৎ হলদেটে রঙের তৈলাক্ত পদার্থরূপে মেদ বা চর্বি সঞ্চিত থাকে। ইহা ব্যতীত শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের উপরেও মেদ সঞ্চিত হয়। মেদ দেহের কোমলতা আনে ও উত্তাপ রক্ষা করে। অনশন বা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের সময় সঞ্চিত খাদ্যরূপে জমা মেদ যতদিন সম্ভব ততদিন দেহের পুষ্টি যোগায়।

মাংসপেশী

ত্বক্ ও মেদের তলায় যে লাল মাংসপিণ্ড থাকে তাহাই মাংসপেশী। এক একটি মাংসপেশী অসংখ্য টিস্যুদ্বারা গঠিত। নরদেহে বড়, মাঝারি ও ছোট মিলাইয়া প্রায় ছয়শত মাংসপেশী আছে। অধিকাংশ মাংস-পেশীরই দুইটি অংশ আছে,—যেমন, মাঝের মাংসল স্থূল অংশ ও তাহার দুই প্রান্তের সাদা ও চকচকে দড়ির মত শক্ত অংশ। এই অংশটিকে কণ্ডরা বলে। ইহা ঠিক মাংসপেশীর অন্তর্গত নহে। কণ্ডরার দ্বারা মাংসপেশী হাড়ের সঙ্গে আটকান থাকে।

মাংসপেশীর মধ্য দিয়া নার্ভ ও রক্তবাহী নালী চলিয়া গিয়াছে। নার্ভ-গুলি মাংসপেশীর সকল প্রকার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তবাহী নালীর

সাহায্যে খাদ্যের পুষ্টিকর পদার্থগুলি পেশীর প্রতি কোষে যাইয়া পৌঁছায়। রক্তের সহিত কোষগুলিতে অক্সিজেন আসে এবং উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডও কোষ হইতে নির্গত হইয়া রক্তে যাইয়া মিশে। স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ গুটাইবার ও ছড়াইবার ক্ষমতা মাংসপেশীর একটি বিশেষ ধর্ম। মৃত্যুর পর কঠিন হইয়া যাওয়াও মাংসপেশীর আর এক ধর্ম।
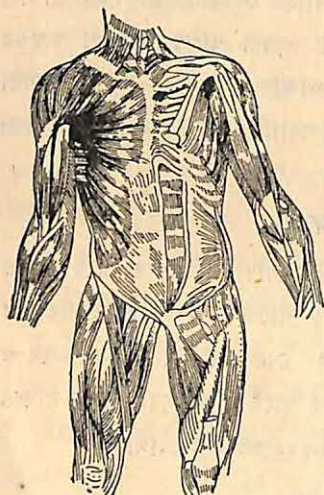
মাংসপেশী

হাত, পা, মুখ, চোখ, বুক, পেট প্রভৃতির মাংসপেশীগুলিকে আমরা ইচ্ছানুসারে সঞ্চালন করিতে পারি। যেমন, হাত মুড়িবার ইচ্ছা করা মাত্র হাতের পেশী সঙ্কুচিত হইয়া উহা মুড়িয়া দেয়; চলিবার ইচ্ছা করিলে পায়ের পেশীগুলি এমন ভাবে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় যে পা চলিতে থাকে। এই প্রকার মাংসপেশীকে ইচ্ছাধীন পেশী বলে।

হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতির মাংসপেশী কিন্তু অন্য প্রকার। এই প্রকার পেশীর উপর কাহারও ইচ্ছা খাটে না, অর্থাৎ কেহই ইচ্ছাদ্বারা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বা পাকস্থলীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ বন্ধ করিতে পারে না। এই পেশীগুলি নিজেদের ইচ্ছায় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় বলিয়া উহাদের স্বাধীন পেশী বলা হয়।

পেশীর সাহায্যে ধরা, ছোঁওয়া, দেখা, খাওয়া, চলা প্রভৃতি সমস্ত কাজই হইয়া থাকে। পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসকার্য ও খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি কাজ চলে। পেশী দেহের রূপদান করে।

নরকঙ্কালের কুশ্রী ও ভয়ঙ্কর চেহারাটি পেশীর আবরণে জড়ান থাকে বলিয়া দেখিতে সুন্দর হয়।

নরকঙ্কাল

নরকঙ্কালটি ছোট, বড়, সোজা, বাঁকা, চ্যাপ্টা, গোল, মোটা, পাতলা প্রভৃতি নানা প্রকারের হাড় দ্বারা গঠিত। হাড় দেহের সর্বাপেক্ষা ভারী ও শক্ত টিস্থ। হাড়ের উপরের অংশটি খুব শক্ত ও নিরেট। ইহার ভিতর দিয়া নার্ভ ও রক্তবাহী নালী চলিয়া যায়। ভিতরের অংশটি ফাঁপা অথবা ঘন জালের মত ঝাঁঝরি দিয়া তৈয়ারী। ইহার মধ্যে মজ্জা বলিয়া এক প্রকার নরম মাখনের মত পদার্থ থাকে। আকার ও কার্য অনুসারে হাড়গুলিকে চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়; যেমন—(১) দীর্ঘ অস্থি, (২) ক্ষুদ্র অস্থি, (৩) চ্যাপ্টা ও পাতলা অস্থি ও (৪) অসমগঠন অস্থি।

হাড়ের দুইটি প্রান্ত উপাস্থি বা তরুণাস্থি নামক এক প্রকার নরম ও স্থিতিস্থাপক পদার্থ দ্বারা গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশ চালনা কালে দুইটি হাড়ের সংযোগস্থলে যাহাতে ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সেই জন্যই তরুণাস্থি থাকে। ইহা ব্যতীত প্রতি দুইটি হাড়ের সংযোগস্থলে এক প্রকার তৈলাক্ত পিচ্ছিল পদার্থ থাকায় হাড়গুলি সহজে নড়াচড়া করিতে পারে। দুইটি হাড়ের সংযোগস্থলকে সন্ধি বলা হয়। প্রত্যেক সন্ধিতে পরস্পর সংলগ্ন হাড়ের প্রান্তদ্বয় সন্ধি-বন্ধনী নামক এক প্রকার দড়ির মত পদার্থ দ্বারা আটকান থাকে।

পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে ২০৬ খানি বিভিন্ন প্রকার হাড় আছে। বর্ণনার সুবিধার জন্য সমস্ত নরকঙ্কালটিকে আটটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। যেমন,—(১) করোটি, (২) মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া, (৩) কাঁধ, (৪) বুক, ও পিঠ, (৫) হাত, (৬) শ্রোণিচক্র বা বস্তি, (৭) পা ও (৮) অন্যান্য।

কাঠামোর মাথার অংশের নাম করোটি। উহা খুলি, নাকের হাড় ও চোয়াল লইয়া গঠিত। খুলি হাড় দিয়া তৈয়ারী একটি প্রায় গোলাকার

বাক্স বিশেষ। ইহার ভিতর মস্তিষ্ক থাকে। নাক ও উপর চোয়ালের হাড় খুলির সহিত দৃঢ়ভাবে আটকান। নীচের চোয়ালের হাড় কিন্তু উপর চোয়ালের সহিত আটকান থাকে। করোটির হাড়গুলি পরস্পরের সহিত অস্থি-বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে না।
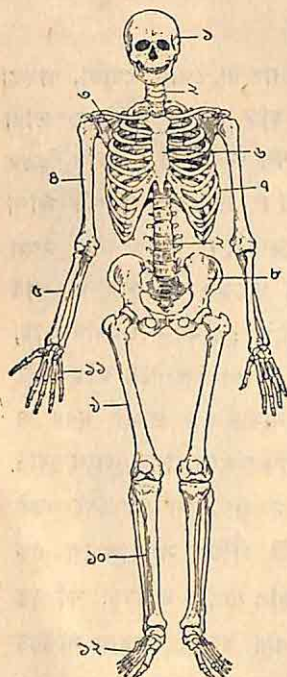
নরকঙ্কাল

১—করোটি ; ২—মেরুদণ্ড ; ৩—কাঁধের হাড় ; ৪—উপর হাতের হাড় ; ৫—হাতের মাঝের অংশের হাড় ; ৬—বুকের হাড় ; ৭—পাঁজরা ; ৮—শ্রোণিচক্র ; ৯—উরুর হাড় ; ১০—জঙ্ঘার হাড় ; ১১—করের হাড় ; ১২—চরণের হাড়।

কাঠামোর ধড়ের অংশের পিছন দিকে ঈষৎ বাঁকান কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড় দ্বারা গঠিত মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে। ইহা করোটির শেষ হইতে পাছার তলা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং গলা, পিঠ, কটি, বস্তি ও লেজ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কশেরুকা নামক ছোট ছোট হাড়ের টুক্‌রা দিয়া মেরুদণ্ডটি গঠিত—এইগুলি পর পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে এবং সহজে খুলিয়া যায় না। মেরুদণ্ডটি একটি মাত্র হাড়ের দ্বারা গঠিত নহে বলিয়া আমাদের পিঠ কাঠের মত শক্ত নহে ; এবং পর পর কশেরুকা সাজাইয়া তৈয়ারী বলিয়াই আমরা ইচ্ছামত পিঠ বাঁকাইতে পারি। পিঠের কশেরুকাগুলির সঙ্গে পাঁজরার হাড় আটকান থাকে। কশেরুকার উপরের বা পিঠের দিকের অংশগুলি আংটির মত দেখিতে। পর পর সাজান

কশেরুকার আংটিগুলির মধ্যস্থলে ফাঁক থাকার জন্ম মেরুদণ্ডের এই অংশটি ফাঁপা নলের মত দেখায়। মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নাকাণ্ড বাহির হইয়া উহার ভিতর দিয়া তলার দিকে চলিয়া যায়।

কাঠামোর কাঁধের অংশ দুইটি চ্যাপ্‌টা কাঁধের হাড় ও দুইটি কণ্ঠার হাড় লইয়া গঠিত। দেহের প্রতি পাশে সেইদিককার কাঁধের হাড় হইতে বাহুর উপর অংশের হাড় ঝুলিয়া থাকে। প্রতি পাশের কণ্ঠার হাড়টি একদিকে কাঁধের হাড় অন্যদিকে বুকের হাড়ের সহিত আটকান।

বুকের কাঠামোটি হাড়ের তৈয়ারী খাঁচার মত দেখিতে। সামনের দিকে একটি চ্যাপ্‌টা ছোরার মত দেখিতে বুকের হাড় এবং উভয় পাশের বারোটি করিয়া চব্বিশটি পাঁজরার হাড়ই খাঁচার প্রধান উপাদান। পাঁজরাগুলি চ্যাপ্‌টা ও বাঁকা হাড়ের দ্বারা গঠিত। ইহাদের সামনের দিকে নরম উপাস্থি বা তরুণাস্থি থাকে। পাঁজরাগুলির মধ্যে শেষের দুই জোড়া বাদে বাকী সবগুলিই পিছন দিকে পিঠের কশেরুকা ও সামনের বুকের হাড়ের সহিত আটকান। শেষ দুই জোড়া কেবল পিঠের শেষ দুইটি কশেরুকা হইতে ঝুলিতে থাকে। খাঁচার পিছন দিকটি পিঠের কাঠামোর দ্বারা গঠিত। মেরুদণ্ডের গলার সাতটি কশেরুকার পর হইতে বারোটি কশেরুকা লইয়া নরকঙ্কালের পিঠের কাঠামো গঠিত। বুক ও পিঠের হাড়ের দ্বারা যে খাঁচার কাঠামোটি তৈয়ারী হয় তাহার নাম বক্ষগহ্বর। উহার ভিতর অন্ননালী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্র থাকে।

প্রতিটি হাতে উপরের হাত, হাতের তলার দিক ও কর বলিয়া তিনটি অংশ আছে। করের হাড়ের সংখ্যা সাতাশটি। কব্জি, হাতের তালু ও পাঁচটি আঙ্গুল লইয়া কর গঠিত। কব্জিতে আটটি ছোট ছোট হাড়, তালুতে পাঁচটি সরু হাড় এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুইটি ও বাকী চারিটি আঙ্গুলের প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া ছোট হাড় আছে।

পাছা বা নিতম্বদেশের দুইখানি পাতলা ও শক্ত নিতম্বের হাড় এবং

পিছনদিকের পাঁচটি কশেরুকা জুড়িয়া তৈয়ারী বস্তির হাড় দ্বারা শ্রোণিচক্র গঠিত। নিতম্বের হাড় দুইটি সামনের দিকে উপাস্থি দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং পিছনের দিকে বস্তির হাড়ের সহিত আটকান। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে শ্রোণিচক্রটি দেখিতে অনেকটা গামলার মত। উহার খোলকে উদরগহ্বর বা বস্তিকোটর বলা হয়। ইহার ভিতর বৃহৎ অন্ত্র, মূত্রাশয়, বৃক্ক প্রভৃতি যন্ত্রগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়। প্রতিটি নিতম্বের হাড় হইতে সেইদিকের পায়ের উপর অংশের হাড় ঝুলিতে থাকে।

প্রতি পায়ের কাঠামোতে উরু, জঙ্ঘা ও চরণ এই তিনটি অংশ আছে। পায়ের উপর অংশের বা উরুর হাড় খুব শক্ত, মোটা ও লম্বা। জঙ্ঘায় একটি মোটা ও একটি সরু লম্বা হাড় এবং উরু ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে মালাইচাকী বলিয়া একটি পাতলা ও ভঙ্গুর হাড় আছে। চরণের হাড়ের সংখ্যা ছাব্বিশটি এবং গোড়ালি, পায়ের পাতা ও পাঁচটি আঙ্গুল লইয়া চরণ গঠিত। গোড়ালিতে সাতটি, পায়ের পাতায় পাঁচটি ও আঙ্গুল পাঁচটিতে চৌদ্দটি হাড় আছে। আঙ্গুলের হাড়গুলির ভিতর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুইটি ও বাকী প্রত্যেকটি আঙ্গুলে তিনটি করিয়া হাড় থাকে।

নরকঙ্কালের প্রধান প্রধান হাড় ছাড়া প্রতি কানে তিনটি ও কণ্ঠনালীতে একটি খুব ছোট হাড় আছে।

পাচনতন্ত্র

যে সকল যন্ত্র খাদ্যগ্রহণ, উহার পরিপাক ও শোষণ এবং অসার পদার্থ ত্যাগে অংশ গ্রহণ করে তাহাদের সমষ্টিকে পাচনতন্ত্র বলে। পাচনতন্ত্র পৌষ্টিকনালী ও পরিপাকগ্রন্থি এই দুইভাগে বিভক্ত। মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত যে বৃহৎ নলটির ভিতর খাদ্যদ্রব্য ঢুকিয়া পরিপাক হয় এবং সার অংশ দেহ মধ্যে শোষিত ও অসার অংশ মলে পরিণত হয় তাহাকে পৌষ্টিকনালী বলে। পরিপাক কার্যে সহায়ক গ্রন্থিগুলির নাম লালাগ্রন্থি, যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়।

পৌষ্টিকনালীর প্রথম অংশের নাম মুখগহ্বর। এই স্থানে খাদ্যের স্বাদ বুঝিবার ও তাহাকে ভিতর দিকে পাঠাইবার জন্য জিহ্বা এবং খাদ্যকে কাটিয়া, ছিঁড়িয়া ও চিবাইয়া নরম করিবার উপযোগী বিভিন্ন প্রকার দাঁত আছে।

জিহ্বার দ্বারা আমরা খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করি এ স্বাদ গ্রহণের জন্য জিহ্বার উপর পৃষ্ঠে ছোট ছোট দানার মত জিহ্বাগুটি আছে। এই গুলির ভিতরে স্বাদকোরক থাকে। স্বাদ-অনুভূতি এই কোরকগুলির সংলগ্ন নার্ভ দিয়া মস্তিষ্কে যায় এবং তাহার ফলে আমরা খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ বুঝিতে পারি। জিহ্বার ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্বাদকোরক ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।

পৌষ্টিকনালা

১—মুখগহ্বর; ২—অন্ননালী; ৩—পাকস্থলী; ৪—ক্ষুদ্র অন্ত্র (গ্রহণী); ৫—ক্ষুদ্র অন্ত্রের শেষ অংশ; ৬—বৃহদন্ত্র —নীচে মলাশয়; ৭—মলনালী।

জিহ্বা মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। ইহার দ্বারা স্বাদগ্রহণ ব্যতীত আহার্য দ্রব্যকে মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করা যায়। চর্বিত ও লালারস মিশ্রিত পিচ্ছিল খাদ্যপিণ্ডকে গলাধঃকরণ করিতে জিহ্বাই সাহায্য করে।

দাঁতগুলি দুই পাটিতে উপর ও নীচের চোয়ালে সাজান থাকে। দাঁত শক্ত ও সাদা হাড়ের মত দেখিতে হইলেও উহা হাড় নয়। কচি শিশুদের দাঁত থাকে না, ছয় সাত মাস বয়স হইতে উঠিতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক পাটিতে দশটি করিয়া মোট কুড়িটি দাঁত ওঠে।

এইগুলি 'দুধে দাঁত'। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই দাঁতগুলি পড়িয়া নূতন স্থায়ী দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। পূর্ণবয়স্ক লোকের উপর-নীচ দুই পাটিতে ষোলটি করিয়া মোট বত্রিশটি দাঁত থাকে। প্রত্যেক পাটির সামনের দিকে খাদ্যদ্রব্য কামড়াইবার বা কাটিবার জন্য চারিটি চ্যাপ্টা কর্তন বা দংশন দন্ত থাকে। এই চারটি দাঁতের এক একদিকে একটি করিয়া মোট দুইটি খাদ্যদ্রব্য ছিঁড়িবার উপযোগী ছেদনদন্ত বা শ্বদন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি ছেদনদন্তের পর প্রতিধারে দুইটি করিয়া চিবাইবার উপযোগী যে চারিটি দাঁত থাকে তাহাদের নাম চর্বণদন্ত। ইহাদের প্রতিধারে তিনটি করিয়া পিষিবার উপযোগী মোট ছয়টি পেষণদন্ত থাকে।

মুখগহ্বরে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি আছে। এইগুলি হইতে লালা বাহির হইয়া খাদ্যদ্রব্যকে ভিজাইয়া নরম এবং পিচ্ছিল করে এবং খাদ্যের শ্বেতসারকে শর্করায় পরিবর্তিত করে। লালায় টায়ালিন বলিয়া এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকায় তাহার দ্বারা এইরূপ পরিবর্তন সম্ভব হয়।

মুখগহ্বরের পিছনের অংশের নাম গলবিল। এই স্থান হইতে শ্বাসনালী বাহির হইয়াছে। শ্বাসনালীটির উপর অধিজিহ্বা বলিয়া একটি মাংসল ঢাক্নি আছে। উহার কাজ খাইবার সময়ে শ্বাস-নালীটিকে এমনভাবে ঢাকিয়া রাখা যাহাতে খাদ্যদ্রব্য শ্বাসনালীতে ঢুকিতে না পারে। কোন রকমে খাদ্যের কণা শ্বাসনালীতে ঢুকিলে আমাদের বিষম লাগে।

গলবিলের পরের অংশের নাম অন্ননালী। খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরে চর্বিত ও লালামিশ্রিত হইয়া অন্ননালী দিয়া পাকস্থলীতে গিয়া পৌছায়।

পাকস্থলী পৌষ্টিকনালীর সর্বাপেক্ষা মোটা অংশ। উহা মধ্যচ্ছদার তলায় থাকে। পাকস্থলীর ভিতরের গায়ে অসংখ্য রসস্রাবী গ্রন্থি আছে। সেইগুলি হইতে নিঃসৃত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বলিয়া একপ্রকার

অম্লরস এবং পেপসিন ও রেনিন নামক দুইটি জারকরস খাদ্যকে পরিপাক করিতে সাহায্য করে। অম্লরস, জারকরস ও লালামিশ্রিত খাদ্যপিণ্ড
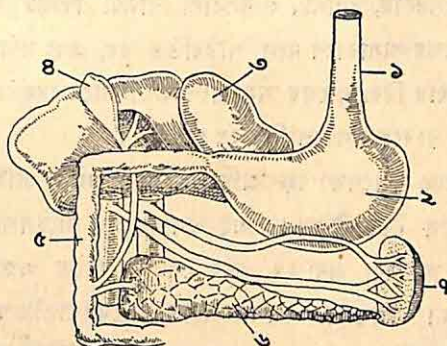
পাচনতন্ত্রের অংশ

১—অন্ননালী ; ২—পাকস্থলী ; ৩—যকৃৎ ; ৪—পিত্তকোষ ; ৫—গ্রহণী ; ৬—অগ্ন্যাশয় ; ৭—প্লীহা।

পাকস্থলীর ক্রমাগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে পিষিয়া কাদার মত থকৃথকে হইয়া অতি সহজেই জীর্ণ হয়।

জীর্ণ খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্রান্তে পৌছায়। পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সংযোগস্থলে পেশীর দ্বারা গঠিত একটি দ্বার আছে। খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইলে পরে উহা খুলিয়া যায়। তাহাতেই পিণ্ডবৎ খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে ঢুকিতে পারে। ক্ষুদ্রান্ত্র পৌষ্টিকনালীর সর্বাপেক্ষা বড় অংশ—ইহা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা। ইহার তিনটি ভাগ আছে ;—তাহার মধ্যে প্রথম ভাগটির নাম গ্রহণী বা ডিওডিনাম। এই অংশে যকৃৎ হইতে পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় হইতে ক্লোমরস আসিয়া জমা হয়। গ্রহণীর ভিতরের গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসস্রাবী গ্রন্থি হইতে আন্ত্রিক রস নামক একপ্রকার রসও নিঃসৃত হয়। পিত্তরস, ক্লোমরস ও আন্ত্রিকরস জীর্ণ খাদ্যদ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে

পরিপাক করায়। খাদ্যের সারপদার্থ শরীরে শোষিত হয়; অবশিষ্ট অসারাংশ বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে।

বৃহদন্ত্রের সরলান্ত্র, মলাশয়, ও মলনালী বলিয়া তিনটি অংশ আছে। সরলান্ত্রে খাদ্যের অসারাংশ মলে পরিবর্তিত হয়, এবং মলাশয়ে উহা জমা থাকে। মলদ্বার দিয়া খাদ্যের অসারাংশ মল হিসাবে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। বৃহদন্ত্রে জল শোষিত হয়।

যকৃৎ দেহের সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থি। ইহার ওজন প্রায় দুই সের। ইহাতে পিত্তরস তৈয়ারী হয়। এই রস যকৃতের নীচে পিত্তকোষ নামক একটি থলিতে আসিয়া জমা হয় এবং সেখান হইতে একটি নল দিয়া ক্ষুদ্রান্তে পড়ে। পিত্তরস প্রধানতঃ ফ্যাট্ বা স্নেহজাতীয় পদার্থকে জীর্ণ ও শোষিত হইতে সাহায্য করে। ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত চিনি যকৃতে আসিয়া গ্লাইকোজেন নামক এক প্রকার চিনি জাতীয় পদার্থরূপে জমা হয়। যকৃৎই দেহের চিনির ভাণ্ডার। অবশ্য মাংসপেশীতেও কিছু চিনি জমা হয়। পাকস্থলীর বামপার্শ্বে প্লীহা বলিয়া গাঢ় লাল রঙের একটি যন্ত্র আছে। উহা কিন্তু পাচনতন্ত্রের অন্তর্গত নহে। অগ্ন্যাশয়টি গোলাপী রঙের মাঝারি আকারের গ্রন্থি। ইহা হইতে ক্লোমরস বাহির হয়। উহা একটি নলের দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রে পড়ে। অগ্ন্যাশয় হইতে ইনসুলিন নামক আর একটি রস নিঃসৃত হইয়া রক্তে মিশে। ইহার অভাবে চিনি জাতীয় পদার্থ জীর্ণ হয় না। ইনসুলিন যাইবার জন্য কোন বিশেষ নল নাই।

রক্তসঞ্চালনতন্ত্র

যে সকল যন্ত্রদ্বারা মানবদেহে রক্ত চলাচল হয় উহাদের সমষ্টি লইয়া রক্তসঞ্চালনতন্ত্র গঠিত হয়। হৃৎপিণ্ড এই তন্ত্রের প্রধান যন্ত্র। উহা বক্ষ-গহ্বরের বাম দিকে থাকে এবং পাম্পের মত কাজ করে। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত ধমনী নামক রক্তবাহী নালীগুলির দ্বারা শরীরে সঞ্চালিত হয়,

এবং শিরা নামক রক্তবাহী নালীগুলির দ্বারা সারা দেহ হইতে রক্ত হৃদপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। শিরা সাধারণতঃ অশুদ্ধ বা অক্সিজেনশূন্য রক্ত এবং ধমনী বিশুদ্ধ বা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত বহন করে—কেবলমাত্র ফুসফুসীয় শিরা ও ধমনীর বেলা ঠিক উল্‌টা ব্যবস্থা দেখা যায়। শিরা ও ধমনীর প্রান্তদেশে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৈশিক নালীতে বিভক্ত হইয়া জালের আকার ধারণ করে। এই জালকে জালক বলে।

হৃৎপিণ্ডটি দেখিতে অনেকটা হরতনের টেক্কা বা নোনাফলের মত এবং উহা পেরিকার্ডিয়াম বলিয়া একটি পাত্‌লা থলির ভিতর ঢাকা থাকে।
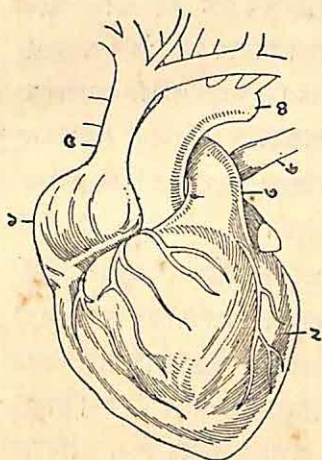
হৃৎপিণ্ড এবং প্রধান শিরা ও ধমনী

১—দক্ষিণ অলিন্দ ; ২—নিলয় (বাম অংশ) ; ৩—ফুসফুসীয় ধমনী ; ৪—মহাধমনী ; ৫—উর্ধ্ব মহাশিরা ; ৬—ফুসফুসীয় শিরা।
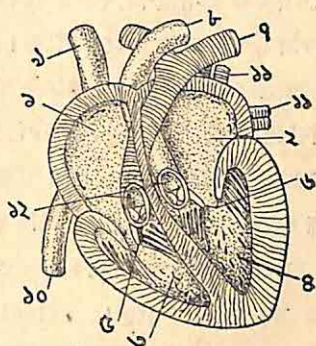
হৃদপিণ্ডের লম্বালম্বি ছেদ

১—দক্ষিণ অলিন্দ ; ২—বাম অলিন্দ ; ৩—দক্ষিণ নিলয় ; ৪—বাম নিলয় ; ৫-৬ – কপাটিকা ; ৭—ফুসফুসীয় ধমনী ; ৮—মহাধমনী ; ৯—উর্ধ্ব মহাশিরা ; ১০—নিম্ন মহাশিরা ; ১১—ফুসফুসীয় শিরা ; ১২—ধমনীর কপাটিকা।

হৃদপিণ্ডের ভিতরটা ফাঁপা এবং চারিটি কুঠ্‌রিতে বিভক্ত। উপরের কুঠ্‌রি

দুইটির নাম দক্ষিণ ও বাম অলিন্দ। নীচের কুঠ্‌রি দুইটিকে দক্ষিণ ও বাম নিলয় বলে। এক অলিন্দ হইতে আর একটিতে বা এক নিলয় হইতে অন্যটিতে রক্ত যাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু দক্ষিণ অলিন্দ হইতে দক্ষিণ নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে রক্ত ঢুকিবার জন্য দুইটি ছিদ্রপথ আছে। এই ছিদ্রপথ দুইটিতে কপাটিকা বা দরজা লাগান আছে। দক্ষিণ অলিন্দ ও নিলয়ে অক্সিজেনহীন অশুদ্ধ রক্ত এবং বাম অলিন্দ ও নিলয়ে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত আসিয়া জমা হয়। সাধারণ অবস্থায় হৃৎপিণ্ড মিনিটে বাহাত্তর বার সঙ্কুচিত ও বাহাত্তর বার প্রসারিত হয়। সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলেই বুকের ধুকধুকানি শব্দ সৃষ্টি হয় এবং দেহে একটানা রক্তস্রোত বহিতে থাকে। হঠাৎ ভয় পাইলে বা উত্তেজিত হইলে অবশ্য হৃৎস্পন্দনের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। অসুস্থ শরীরে হৃৎস্পন্দন সাধারণ অবস্থা হইতে কম-বেশি হয়। মাতৃগর্ভেই মানুষের হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হয় এবং উহা মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমানে চলে। হৃৎপিণ্ডের এই স্পন্দন বন্ধ হইলেই বোঝা যায় যে প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে।

হৃৎপিণ্ডের পিছন দিকে উর্ধ্বমহাশিরা ও নিম্নমহাশিরা বলিয়া দুইটি বড় বড় শিরা আছে। উহারা দুইটি ছিদ্রপথ দিয়া দক্ষিণ অলিন্দের সহিত সংযুক্ত। দেহের উপর অংশের শিরাগুলি উর্ধ্বমহাশিরায় এবং নীচের অংশের শিরাগুলি নিম্নমহাশিরায় আসিয়া মিলিয়াছে। ইহা ছাড়া প্রতিটি ফুসফুস হইতেও দুইটি দুইটি করিয়া চারটি ফুসফুসীয় শিরা আসিয়া বাম অলিন্দের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের গাত্রপ্রাচীর হইতেও দূষিত রক্ত করোনারি সাইনাস নামক একটি শিরা দিয়া দক্ষিণ অলিন্দে যায়।

দক্ষিণ অলিন্দ হইতে একটি ফুসফুসীয় ধমনী উঠিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ ও বাম দিকের ফুসফুসে ঢুকিয়াছে। বাম নিলয় হইতে একটি মহাধমনী বাহির হইয়া অনেকগুলি ধমনীতে বিভক্ত হইয়াছে ও সারা দেহে

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মহাধমনী ছাড়াও বাম নিলয় হইতে করোনারি ধমনী বলিয়া একটি বিশুদ্ধ রক্তবাহী নালী বাহির হইয়া হৃৎপিণ্ডের গায়ের পেশীতে রক্ত সরবরাহ করে।

বিভিন্ন শিরার দ্বারা দেহ হইতে অশুদ্ধ রক্ত মহাশিরা দুইটিতে আসে। হৃৎপিণ্ডের অলিন্দ দুইটি প্রথমে প্রসারিত হয় এবং তাহার ফলে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা এবং করোনারি সাইনাস হইতে অশুদ্ধ রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে ঢোকে। সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসীয় শিরাগুলির দ্বারা ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে ঢোকে। রক্তে পূর্ণ হইলে অলিন্দের সঙ্কোচনের ফলে দক্ষিণ অলিন্দ হইতে অশুদ্ধ রক্ত এবং বাম অলিন্দ হইতে বিশুদ্ধ রক্ত ছিদ্রপথের কপাটিকা ঠেলিয়া দক্ষিণ ও বাম নিলয়ে যায়। এই সময়ে নিলয়ের প্রসারণ হয়। রক্তে পূর্ণ হইলে নিলয়ের সঙ্কোচন হয়। দক্ষিণ নিলয়ের সঙ্কোচনের চাপের ফলে রক্ত ফুসফুসীর ধমনীর দ্বারা ফুসফুসে যায়। ঐ চাপের ফলে বাম নিলয়ের বেশির ভাগ বিশুদ্ধ রক্ত সবেগে মহাধমনীতে ঢোকে। কিছু রক্ত অবশ্য করোনারি ধমনী দিয়া হৃৎপিণ্ডের গাত্রপ্রাচীরে যায়। এই সময় মহাধমনীর প্রথম অংশ প্রসারিত হয়,
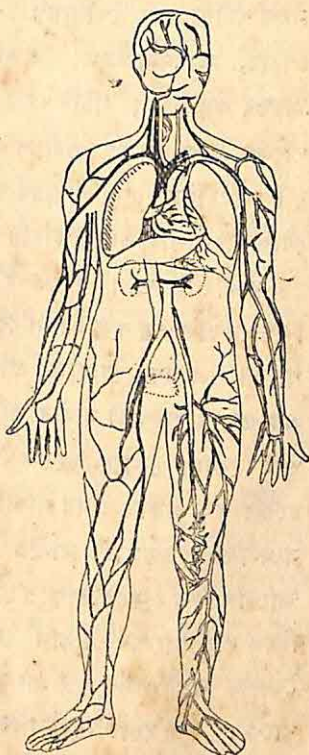
নরদেহের শিরা ও ধমনী (কালোগুলি শিরা এবং সাদাগুলি ধমনী)।

আবার যখন বাম নিলয় প্রসারিত হয় তখন মহাধমনীর সেই অংশ সঙ্কুচিত হয়। এইভাবে মহাধমনীর পর পর অংশে এবং ধমনীগুলিতে স্পন্দন ছড়াইয়া পড়ে। এই স্পন্দনের সংখ্যাও মিনিটে বাহাত্তর বার। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এইভাবে সমস্ত ধমনীতে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার চাপে সমস্ত শরীরে রক্ত পৌঁছায়। বাম নিলয় যে চাপে মহাধমনীতে রক্ত পাঠায়, মহাধমনী এমন কি ধমনীগুলির প্রায় প্রান্তদেশেও সেই চাপ অনুভব করা যায়। চিকিৎসকগণ কব্জিতে হাত দিয়া যে নাড়ী দেখিয়া থাকেন, তাহা এই চাপ পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নহে। ধমনীর স্পন্দন যদি অনিয়মিত হয় বা সাধারণ অবস্থায় মিনিটে বাহাত্তর অপেক্ষা কমবেশি থাকে তাহা হইলে তাঁহার শরীর ঠিক নাই এই তথ্য বুঝিতে পারেন।

ধমনীগুলি ভাগ হইতে হইতে অতি সূক্ষ্ম ধমনীতে পরিণত হয়। কিন্তু সেগুলি এত সূক্ষ্ম হয় না যে দেহের প্রতি কোষের নিকট পৌঁছাইতে পারে। এইজন্য তাহাদের প্রান্তদেশ অতিশয় সূক্ষ্ম কৈশিক নালী নামক এক প্রকার রক্তবাহী নালীর সহিত সংযুক্ত থাকে। এই কৈশিক নালীগুলি কোষে কোষে রক্তের অক্সিজেন ও সারবান পদার্থ লসিকা বা রক্তের এক প্রকার রসের সাহায্যে পৌঁছাইয়া দেয় এবং বহুসংখ্যক একসঙ্গে মিলিয়া রক্তবাহী নালীর জালের সৃষ্টি করে। একটি টর্চলাইটের আলোর দিক হাতের তালুতে চাপিয়া সুইচ্ টিপিয়া দিলে তালুর উল্টাদিকে লাল আলোর যে দাগ দেখা যায়, তাহা রক্তবাহী জালকের জন্য। কৈশিক নালীগুলির অন্য প্রান্ত আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার সহিত সংযুক্ত থাকে। সেই ছোট ছোট শিরাগুলি একত্র হইয়া দেহের বড় বড় শিরা তৈয়ারী করে, এবং ঐগুলির মধ্যে দেহের উপরাংশের শিরাগুলি ঊর্ধ্বমহাশিরায় ও নিম্নাংশেরগুলি নিম্নমহাশিরায় আসিয়া মিলিত হয়। ধমনীগুলি যেমন কৈশিক নালী দিয়া লসিকার সাহায্যে কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছাইয়া দেয়, সেইরূপে দেহকোষগুলিতে উৎপাদিত কার্বন ডাই-

অক্সাইড ও অন্যান্য পদার্থগুলিও লসিকার সাহায্যে কৈশিক নালী, এবং কৈশিক নালী হইতে শিরায় আসে। এই সকল পদার্থ বা কোষ-মল বহিয়া আনে বলিয়া সাধারণতঃ শিরার রক্তকে দূষিত রক্ত বলা হয়। মহাশিরা দুইটি দিয়া এইপ্রকার দূষিত রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে, এবং সেখান হইতে দক্ষিণ নিলয়ে পৌছায়। করোনারি সাইনাস দিয়া হৃৎপিণ্ডের গাত্রপ্রাচীর হইতে দূষিত রক্ত দক্ষিণ অলিন্দে আসে। নিলয়ের সঙ্কোচনের ফলে এই রক্ত ফুস্‌ফুসীয় ধমনী দিয়া ফুস্‌ফুসে যায় এবং দূষিত রক্তবাহী ফুস্‌ফুসের কৈশিক নালীগুলি সেইখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ ও অক্সিজেন গ্রহণ করে। প্রতি ফুস্‌ফুসে এই নালীগুলি মিলিত হইয়া দুইটি ফুস্‌ফুসীয় শিরা গঠন করে। এইরূপ দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি শিরার দ্বারা শোধিত বা অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বাম অলিন্দে এবং সেখান হইতে বাম নিলয়ে আসে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত কোষে কোষে উৎপন্ন অন্যান্য দূষিত পদার্থগুলির বেশির ভাগই বৃক্কের সাহায্যে রক্ত হইতে পৃথক্ হইয়া প্রস্রাব দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হয়।

উপরে তিন প্রকার রক্ত সঞ্চালন প্রণালীর কথা বলা হইল। ইহাদের নাম বৃহত্তর রক্তসঞ্চালন প্রণালী, ক্ষুদ্রতর রক্তসঞ্চালন প্রণালী ও করোনারি রক্তসঞ্চালন প্রণালী। মহাধমনী দিয়া দেহে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া পুনরায় মহাশিরা দিয়া যে প্রণালীতে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে তাহাকে বলা হয় বৃহত্তর রক্তসঞ্চালন প্রণালী। ফুস্‌ফুসীয় ধমনী দিয়া ফুস্‌ফুসে যাইয়া আবার ফুস্‌ফুসীয় শিরার দ্বারা যে প্রণালীতে হৃৎপিণ্ডে রক্ত ফিরে উহা ক্ষুদ্রতর রক্তসঞ্চালন প্রণালী। করোনারি ধমনী ও করোনারি সাইনাস দিয়া যে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা দেখা যায় তাহাই করোনারি রক্তসঞ্চালন প্রণালী।

বুঝাইবার সুবিধার জন্য প্রতিটি অলিন্দ ও নিলয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ সম্বন্ধে আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইল। এইখানে মনে রাখা

প্রয়োজন যে অলিন্দ দুইটি একসঙ্গে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, এবং ঐ দুইটি যখন সঙ্কুচিত হয় তখন নিলয় দুইটি প্রসারিত থাকে। আবার ঐ দুইটি যখন প্রসারিত হয় তখন নিলয় দুইটি সঙ্কুচিত হয়।

রক্তের দুইটি অংশ—জলীয় ও কঠিন। জলীয় অংশ খাদ্য পদার্থ, দূষিত পদার্থ ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বাহক। কঠিন অংশ বিভিন্ন প্রকার রক্ত কণিকা দিয়া গঠিত। উহাদের মধ্যে লাল কণিকারা অক্সিজেনের বাহক; সাদা কণিকারা আমাদের রক্ষা করার জন্য জীবাণু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থের সহিত যুদ্ধ করে, এবং পরাজিত হইয়া মরিয়া গেলে পূঁজে পরিণত হয়। অনুচক্রিকারা রক্ত জমিতে সাহায্য করে।

রক্তের জলীয় অংশটির নাম রক্তরস বা প্লাজমা। ইহা সাদা বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। এই রক্তরসেই রক্ত কণিকাগুলি ভাসিয়া থাকে। রক্তরসে নানা প্রকার লবণ, গ্যাস, শর্করা, ফ্যাট্ বা স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ মিশান থাকে। খাদ্যের সার দ্রব্য রক্তরসেই মিশ্রিত হইয়া দেহের প্রতি কোষে যায়, আবার প্রতি কোষ হইতে দূষিত পদার্থ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্তরসের দ্বারাই বাহিত হইয়া দেহ হইতে বাহির হইবার জন্য আসে। দূষিত পদার্থগুলি রক্তরসের দ্বারা বাহিত হইয়া বৃক্কে পৌছাইলে ঐ যন্ত্র তাহাদের রক্তরস হইতে আলাদা করিয়া প্রস্রাবের সহিত বাহির করিয়া দেয়। কোষগুলিতে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্তরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ফুসফুসে উপস্থিত হইয়া নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। রক্তরসে ফাইব্রিনোজেন নামক একটি রাসায়নিক দ্রব্য আছে, ইহা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। রক্তপাত হইলে এই পদার্থটি অনুচক্রিকা ও রক্তে দ্রবীভূত চূণ জাতীয় পদার্থের সাহায্যে ফাইব্রিন নামক এক প্রকার অদ্রাব্য সরু সুতার মত পদার্থে পরিণত হয়। ফাইব্রিনের জালে কিছু রক্ত কণিকা জড়িত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায় এবং তাহাতে রক্তপাত বন্ধ হয়। এই জমাট রক্ত হইতে একপ্রকার রস চুয়াইয়া চুয়াইয়া

বাহির হয়। এই রসটির নাম রক্তমণ্ড বা সিরাম। চূণজাতীয় পদার্থের অভাব ঘটিলে রক্ত জমাট বাঁধিতে দেরী হয়। এইজন্য শরীরের কোন স্থান কাটিয়া রক্তপাত ঘটিলে ঐস্থানে কিছু চূণের জল লাগাইয়া দিলে রক্তপাত বন্ধ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশি।

শ্বাসতন্ত্র

জীবনধারণের জন্য বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ ও দেহে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করার পদ্ধতিকে শ্বাসক্রিয়া বলে। শ্বাসক্রিয়া একবার বন্ধ হইলে জীব আর বাঁচেনা। যে সকল যন্ত্রের দ্বারা শ্বাসকার্য চলে তাহাদের সমষ্টিকে শ্বাসতন্ত্র বলে। ইহাদের নাম (১) নাসিকা, (২) নাসাপথ, (৩) শ্বাসনালী বা বায়ুপথ, (৪) শ্বাসনালিকা ও তাহার শাখা-উপশাখা, ও (৫) ফুস্ফুস্।

নাসিকার দুইটি গর্ত দিয়া আমরা মিনিটে পনের ষোল বার বাতাস গ্রহণ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বাতাস ছাড়িয়া দিয়া থাকি। যে বাতাস আমরা গ্রহণ করি উহা অক্সিজেনে পূর্ণ থাকে, আর যে বাতাস ছাড়িয়া দিই তাহাতে অক্সিজেন কম এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি থাকে। বাতাস টানিয়া লওয়াকে প্রশ্বাস গ্রহণ এবং ছাড়িয়া দেওয়াকে নিশ্বাস ত্যাগ করা বলে।

প্রশ্বাস নাসাপথ দিয়া গলবিলে যায়। গলবিল পেশী ও পর্দা সম্বলিত প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা নল। ইহার সামনের দিকের উপরি-ভাগের সহিত নাসাপথ ও তলার অংশের সহিত মুখগহ্বর সংযুক্ত। আবার পিছনের দিকের সামনের অংশে বায়ুপথ ও পিছনের অংশে খাদ্য-নালী সংযুক্ত থাকে। মুখগহ্বর ও গলবিলের সংযোগ স্থল হইতে আলজিহ্বা নামক একটি মাংসপিণ্ড ঝুলিয়া থাকে। ঐ একই অংশে জিহ্বার গোড়ার দিকে তালুগ্রন্থি বা টন্‌সিল বলিয়া দুইটি গ্রন্থি আছে।

তালুগ্রন্থি মুখগহ্বরের ছাঁকনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাহির হইতে যে সকল জীবাণু প্রবেশ করে তাহাদের বেশির ভাগই তালুগ্রন্থি দুইটিতে আটকাইয়া যায়, এবং সেইজন্যই ইহাদের অধিকাংশ সময় দূষিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের টনসিল পাকে বা ফোলে তাহাদের অতিরিক্ত জীবাণু আটকাইবার ফলেই ঐ গ্রন্থি দূষিত হয়। গলবিল হইতে বাতাস বায়ুপথে বা শ্বাসনালীতে ঢোকে। উহা চার ইঞ্চির উপর লম্বা ও সোয়া দুই ইঞ্চি চওড়া একটি নল। গলবিল হইতে বক্ষগহ্বর পর্যন্ত অন্ননালীর সামনের দিক দিয়া বিস্তৃত এই পথটি দুইটি অংশে বিভক্ত। উপরের অংশটির নাম স্বরযন্ত্র। এই যন্ত্রটির সাহায্যে আমরা কথা বলি, গান গাই বা নানারকম চিৎকার করি। গলবিলের সহিত ইহার সংযোগ স্থলে অধিজিহ্বা নামক একটি ঢাক্‌নি আছে। খাদ্যগ্রহণের সময় এই ঢাক্‌নি বায়ুপথের ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া দেয় বলিয়া উহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য ঢুকিতে পারে না। যদি দৈবাৎ কোনরূপ খাদ্যদ্রব্যের কণা ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে জোর কাশি আরম্ভ হয় এবং শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। এই অবস্থাকে আমরা 'বিষমলাগা' বলিয়া থাকি।

স্বরযন্ত্রটি সন্ধি বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত কতকগুলি উপাস্থি দিয়া গঠিত। দুইটি কোমল মাংসপেশী পর্দার মত লম্বালম্বি ভাবে উঠিয়া যন্ত্রের ভিতরের ফাঁপা অংশটিকে প্রায় রুদ্ধ করিয়া রাখে। যেটুকু সামান্য ফাঁক থাকে তাহার ভিতর দিয়া বায়ুচলাচলের সময় উহারা কাঁপিতে থাকে। এই কোমল মাংসপেশীর পর্দা দুইটিকে স্বরপর্দা বা ভোকাল কর্ড বলা হয়। স্বরযন্ত্রের উপাস্থিগুলি ও স্বরপর্দার যুক্ত ক্রিয়ার ফলে স্বরের উৎপত্তি হয়।

স্বরযন্ত্রের পর হইতে শ্বাসনালী বা বায়ুপথের উপরাংশ পরপর স্থাপিত অর্ধ-বলয়াকৃতি বিশিষ্ট কয়েকটি উপাস্থির দ্বারা গঠিত। কিন্তু বায়ুপথের

নীচের অংশ কেবল মাংসপেশী দ্বারা গঠিত। সেখানে কোনরূপ উপাস্থি নাই। শ্বাসনালী বা বায়ুপথের শেষের দিক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি শ্বাসনালিকা তৈয়ারী হইয়াছে। ইহাদের গঠন শ্বাস-নালীর পিছনের অংশের মত—কেবল মাংসপেশী দ্বারা গঠিত, কোনরূপ উপাস্থি নাই। প্রত্যেক শ্বাসনালিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মত শাখাপ্রশাখা বাহির হইয়াছে। এইগুলিকে শাখা-শ্বাস-নালিকা ও প্রশাখা শ্বাস-নালিকা বলা হয়। ইংরাজীতে প্রতিটি শ্বাসনালিকাকে ব্রঙ্কাস এবং প্রতিটি শাখা বা প্রশাখা শ্বাসনালিকাকে ব্রঙ্কিঅল বলা হয়। প্রশাখা শ্বাসনালিকাগুলি আরও সূক্ষ্ম হইয়া চুলের মত সরু সরু কৈশিক শ্বাসনালিকায় পরিণত হইয়াছে। প্রশ্বাস শ্বাসনালী হইতে শ্বাসনালিকা ও তাহার শাখা, উপ-শাখার পথে বুকের দুই পাশের দুইটি ফুসফুসে ঢোকে।
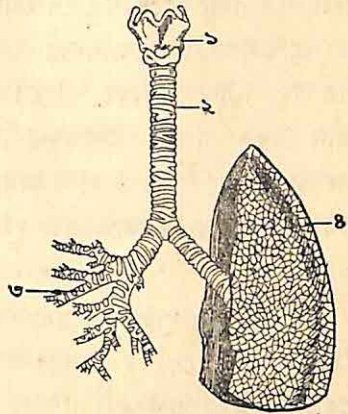
শ্বাসযন্ত্র

১—স্বরযন্ত্র ; ২—শ্বাসনাল ;
৩—শ্বাসনালীর শাখা-প্রশাখা ;
৪—ফুসফুস।

ফুসফুস বক্ষগহ্বরের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকে। উহাদের মধ্যে দক্ষিণ ফুসফুসটি তিন খণ্ডে ও বাম ফুসফুসটি দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। ফুসফুস স্পঞ্জের মত ফাঁপা এবং স্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ টানিলে বাড়িয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে। ফুসফুস-আবরণী বা প্লুরা নামক পাতলা আবরণ দ্বারা ফুসফুসটি ঘেরা থাকে। এই আবরণটি দুইটি পর্দা দ্বারা গঠিত। এই দুইটি পর্দার মাঝের

ফাঁকটিতে লসিকা বলিয়া একপ্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ফুসফুসের সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে সুবিধা হয়। ফুসফুস-আবরণীর প্রদাহ হইলে যে রোগ হয় তাহার নাম প্লুরিসি।

প্রতি ফুসফুসে শ্বাসনালিকার প্রতিটি প্রশাখার সহিত সংলগ্ন বেলুনের মত বায়ুস্থলী বা বায়ুকোষ আছে। ঐগুলিতে রক্তবাহী কৈশিকনালীর জাল বিস্তৃত থাকে। কৈশিকনালীর রক্ত বাতাসের অক্সিজেন শুষিয়া লয় এবং তাহার পরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে ফুসফুসে আসিয়া অক্সিজেনশূন্য দূষিত রক্ত অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়।

অক্সিজেনশূন্য দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনী ও তাহার শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া কৈশিক নালীর জালকে আসে। অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কৈশিকনালী হইতে ফুসফুসীয় শিরার শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়া চারিটি ফুসফুসীয় শিরায় যায় এবং শিরা হইতে বাম অলিন্দে যাইয়া ঢুকে। প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ কার্য ফুসফুসের প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে হয়। বুকের মাংসপেশী ও মধ্যচ্ছদা ফুসফুসকে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতে সাহায্য করে।

নার্ভতন্ত্র

নার্ভতন্ত্রের দ্বারা সমস্ত দেহ-যন্ত্র, কার্যাবলী, মনের গতি, চিন্তা, অনুভূতি ও বিচারশক্তি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা নার্ভতন্ত্রের সাহায্যে দেখা, শোনা, শোঁকা, ছোঁওয়া, ধরা, চলা, খাওয়া, কথা বলা প্রভৃতি কাজ করিতে পারি। আবার যে সকল কাজ আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে, যেমন পৌষ্টিকনালীর ও ফুসফুসের প্রসারণ এবং সঙ্কোচন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রভৃতি, তাহারাও নার্ভতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই তন্ত্রটি মস্তিষ্ক বা ঘিলু, সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুমজ্জা এবং নার্ভ লইয়া গঠিত। এই সমস্তগুলি আবার নার্ভতন্ত্র দ্বারা গঠিত।

নার্ভতন্ত্র দ্বারা গঠিত বিভিন্ন অংশগুলি শুধু চোখে দেখিতে যতই বিভিন্ন প্রকারের হউক না কেন, তাহাদের আণুবীক্ষণিক গঠন, অর্থাৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে যেরূপ দেখিতে হয় সেইরূপ, প্রায় একই প্রকারের। সকল অংশেরই মূল উপাদান নার্ভ-কোষ ও নার্ভসূত্র। অনেকগুলি নার্ভ-কোষ একসঙ্গে মিলিয়া নার্ভ-কেন্দ্র গঠন করে। যে স্থানে নার্ভকেন্দ্রের বেশি আধিক্য সেই স্থানগুলি খালি চোখে দেখিলে ধূসর বর্ণের দেখিতে হয়। কোন কোন স্থানে নার্ভ-কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত স্ফীত হইয়া গোল গোল দানার মত আকার গ্রহণ করে। এই দানাগুলিকে নার্ভগণ্ড বা নার্ভ-গ্রন্থি বলা হয়।

সাধারণ কোষের ন্যায় নার্ভ-কোষে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ ও কোষকেন্দ্র থাকে। তবে তফাতের মধ্যে এই যে, প্রোটোপ্লাজম্ বিশিষ্ট প্রতি কোষটির একদিক অনেকদূর বর্ধিত হইয়া সূতার ন্যায় আকার ধারণ করে এবং অন্যদিক সামান্য বর্ধিত হইয়া নানা শাখা-প্রশাখায় ভাগ হইয়া যায়। কোষের সূতার ন্যায় অংশটির নাম অ্যাক্সন এবং শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট অংশটিকে ডেনড্রাইট্ বলা হয়। একটি নার্ভকোষের অ্যাক্সন অপর কোষের ডেনড্রাইটের সহিত সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি অ্যাক্সনের উপর আবার একটি আবরণ জন্মাইয়া সাদা বা পীতাভ নার্ভসূত্র গঠন করে।
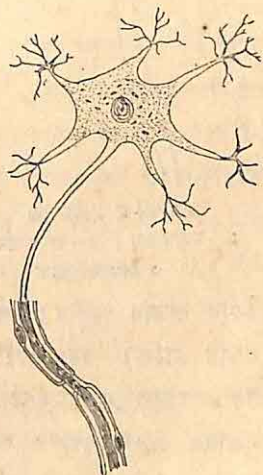
নার্ভকোষ ঃ—উপরাংশে ডেনড্রাইট্ ও নীচের দিকে অ্যাক্সন দেখা যাইতেছে। অ্যাক্সনের শেষ অংশ নার্ভসূত্র গঠন করিয়াছে।

মস্তিষ্ক নার্ভতন্ত্রের প্রধান অংশ। ইহা মহামস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক,

মধ্যমস্তিষ্ক ও নিম্নমস্তিষ্ক এই চারি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগ কয়েকটি বিশেষ কার্য সম্পাদন করে। মস্তিষ্কের উপরের অংশটির নাম মহামস্তিষ্ক। ইহার বহিরাংশ কুণ্ডলী পাকান এবং ধূসর বর্ণের নার্ভকোষে পূর্ণ। ভিতরের অংশটি কিন্তু সাদা রংয়ের এবং নার্ভসূত্রের দ্বারা পূর্ণ। মহামস্তিষ্কের ধূসর অংশই সকল প্রকার অনুভূতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়। বোধশক্তি, স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি, কর্মের প্রেরণা, দয়া, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি সকলেরই উৎপত্তি এই স্থানে। দ্বিতীয় অংশটির নাম লঘুমস্তিষ্ক। ইহা মহামস্তিষ্কের নীচে ও পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রভাব অসীম। কারণ ইহারই সাহায্যে আমরা দেহের ভারসাম্য বজায় রাখি। ইহা ব্যতীত দেহের উভয় পাশের পেশী সমন্বয় এবং উহার দ্বারা সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি কার্যও লঘুমস্তিষ্কের প্রভাবে হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের তৃতীয় অংশটির নাম মধ্যমস্তিষ্ক। ইহা দেহের প্রাথমিক কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহার নীচে মস্তিষ্কের চতুর্থ বা শেষ অংশ অবস্থিত। তাহার নাম নিম্নমস্তিষ্ক বা সুষুম্নাশীর্ষক। এই অংশে তিনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নার্ভকেন্দ্র আছে। উহাদের নাম, (১) শ্বাসকেন্দ্র, (২) হৃদ্‌কেন্দ্র, ও (৩) ধমনীকেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি শ্বাসকার্য-

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড
১—মহামস্তিষ্ক ; ২—লঘুমস্তিষ্ক ; ৩—নিম্নমস্তিষ্ক।

হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা ও রক্তের চাপ ঠিক রাখা প্রভৃতি কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। এই তিনটির একটি নষ্ট হইলেই নিশ্চিত মৃত্যু।

নিম্নমস্তিষ্ক হইতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া মেরুদণ্ডের লেজের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত যে সাদা দড়ির মত বস্তুটি আছে উহাই সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুমজ্জা। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে জোড়ায় জোড়ায় নার্ভ বাহির হইয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারা মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কের তলার দিক হইতে বারো জোড়া নার্ভ বাহির হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, মুখমণ্ডল, পাচনতন্ত্র, রক্তসঞ্চালনতন্ত্র, স্বর কুঠ্‌রি, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির সহিত সংলগ্ন। এই সকল যন্ত্রের কার্যাবলী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের নার্ভ দ্বারা প্রভাবান্বিত।

সুষুম্নাকাণ্ড হইতেও একত্রিশ জোড়া নার্ভ বাহির হইয়াছে। এই নার্ভগুলি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া দেহের ঐচ্ছিক পেশী সকল ও ত্বকে বিস্তৃত থাকে। দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে মস্তিষ্কে সংবাদ পৌছান এবং মস্তিষ্ক হইতে দেহের বিভিন্ন স্থানে আদেশ প্রেরণ সাধারণতঃ সুষুম্নাকাণ্ডের পথেই হয়। কারণ, মস্তিষ্কের ও স্বতন্ত্র নার্ভমণ্ডলের নার্ভগুলি ব্যতীত অন্য সকল নার্ভের পথই সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতর দিয়া। সুষুম্নাকাণ্ডের আর এক প্রকার কাজ হয়। এই কাজটির নাম প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। এই কাজটি মস্তিষ্কের আজ্ঞাধীন নহে।

অনেকগুলি নার্ভরজ্জু একসাথে মিলিত হইয়া মোটা সূতার মত যে একপ্রকার বস্তু তৈয়ারী করে তাহাদের নার্ভ বলা হয়। এইগুলি সাধারণতঃ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে বাহির হইয়া সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে। এইগুলি সংবাদ ও আদেশ আদান-প্রদানের বাহন।

নার্ভ দুই প্রকার—যে সকল নার্ভ শরীরের কোন অংশে আঘাত লাগিলে বা কোন বস্তুর স্পর্শ হইলে সেই সংবাদ, অথবা কোন গন্ধ, শব্দ বা দৃশ্যের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দেয়, তাহাদের সংজ্ঞাবাহী নার্ভ

বলা হয়। আবার যে সকল নার্ভ মস্তিষ্ক হইতে উত্তর বা আদেশ লইয়া যে স্থান হইতে সংবাদ বা অনুভূতি আসিয়াছে সেই স্থানে পৌছাইয়া দেয় তাহাদের চালক নার্ভ বলে। মস্তিষ্কের নার্ভগুলির বেলা সংজ্ঞাবাহী ও চালক নার্ভ আলাদা আলাদা ভাবে থাকে। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের নার্ভগুলি একযোগে সংজ্ঞাবাহী ও চালক এই দুই প্রকার নার্ভের কাজ করে। যে নার্ভসূত্রগুলির দ্বারা ইহারা গঠিত তাহারা দুই প্রকার। কতকগুলি একত্রে মিলিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী বা অন্তর্মুখী নার্ভপথ এবং বাকিগুলি কেন্দ্রাপসারী বা বহির্মুখী নার্ভপথ সৃষ্টি করে। প্রথম প্রকার নার্ভপথ দিয়া সংবাদ বা অনুভূতি সুষুম্নাকাণ্ডে পৌছায় এবং সেখান হইতে মস্তিষ্কে যায়, এবং দ্বিতীয় প্রকার নার্ভপথ দিয়া মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নাকাণ্ডের মারফৎ আদেশ বা উত্তর যে স্থান হইতে সংবাদ বা অনুভূতি পাওয়া যায় সেই স্থানে পৌছায়। সুতরাং কেন্দ্রাভিমুখী বা অন্তর্মুখী নার্ভপথ সংজ্ঞাবাহী নার্ভের কাজ এবং কেন্দ্রাপসারী বা বহির্মুখী নার্ভপথ চালক নার্ভের কাজ করে।

মস্তিষ্কের যে সকল স্থান হইতে নার্ভ বাহির হয় সেই স্থানগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের নার্ভ একটি মাত্র মূল দ্বারা বাহির হইয়াছে। কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের নার্ভগুলির উৎসস্থল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে প্রতিটি নার্ভের দুইটি করিয়া মূল থাকে। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগের নার্ভমূল ও সম্মুখভাগের নার্ভমূল বলা হয়। এই দুইটি বিভিন্ন মূল দিয়া দুইটি ভিন্ন প্রকার কার্যকরী নার্ভপথ বাহির হয়। পিছনের মূল দিয়া অন্তর্মুখী এবং সামনেরটি দিয়া বহির্মুখী নার্ভপথ দুইটি বাহির হয়। এই নার্ভপথ দুইটি কিছুদূর যাইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া নার্ভ তৈয়ারী করে। পিছনের মূলটিতে একটি নার্ভখণ্ড বা নার্ভগ্রন্থি থাকে, সুতরাং উহা দেখিয়া এই মূলটিকে চেনা অতি সহজ।

কিরূপে মানব দেহে খবর আদান-প্রদান চলে? ধরা যাউক হাতের

আঙ্গুল কাটিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে যন্ত্রণায় হাত নাড়িতেছি। কিরূপে ইহা হইতেছে? প্রথমে আঙ্গুলের যে অংশটি কাটিয়াছে সেই অংশের নার্ভ উত্তেজিত হইল, এবং তাহার অন্তর্মুখী নার্ভপথ দিয়া সংবাদ সুষুম্নাকাণ্ডের দিকে চলিতে লাগিল। এই পথ পিছনের নার্ভমূল দিয়া সুষুম্নাকাণ্ডে ঢুকিয়াছে; সুতরাং সংবাদ সুষুম্নাকাণ্ডে পৌছাইল। কিন্তু এখানে বোধশক্তি হয় না, সুতরাং সুষুম্নাকাণ্ডের ভিতর দিয়া আর একটি অন্তর্মুখী পথের দ্বারা সংবাদ মস্তিষ্কের মহামস্তিষ্কে পৌছাইল। এইখানে বোধশক্তির স্থান, সুতরাং বেদনা বোধ হইল। মস্তিষ্কের আদেশ হইল হাত নাড়িতে থাক। আদেশ সুষুম্নাকাণ্ডের বহির্মুখী পথ বাহিয়া সামনের স্নায়ুমূল দিয়া নার্ভে পৌছাইল, এবং নার্ভের বহির্মুখী পথ দিয়া হাতে, এবং শেষকালে আঙ্গুলের পেশীতে পৌছাইল। পেশীরা নার্ভের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র; সুতরাং অবিলম্বে আদেশ পালিত হইল।

অনেক সময় অন্তর্মুখী নার্ভ দ্বারা যে অনুভূতি প্রেরিত হয় তাহার উত্তর মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতীতই সোজাসুজি সুষুম্নাকাণ্ড হইতে আসে। যেমন আমরা যখন ঘুমাইয়া থাকি তখন যদি মশা কামড়ায় তাহা হইলে আমরা ঘুমন্ত অবস্থাতেই হাত বা পা নাড়ি। কিন্তু কেন এরূপ করি তাহা জানি না। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, তখন আমাদের বোধ-শক্তি থাকে না। কিন্তু আমরা অজ্ঞাতসারে এরূপ কার্য করি কেবলমাত্র সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ু কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত এক বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে। এই প্রক্রিয়াটি এইরূপ—মশা কামড়াইবার খবর অন্তর্বাহী নার্ভ দিয়া সুষুম্না-কাণ্ড পর্যন্ত পৌছায়, কিন্তু ঘুমাইয়া থাকার ফলে মস্তিষ্ক অবধি আর খবর পৌছায় না। সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্র হইতেই আমাদের অজ্ঞাতসারে হাত বা পা নাড়িবার হুকুম হয় এবং সেই হুকুম যখন বহির্মুখী নার্ভ দ্বারা যথাস্থানে পৌছায় তখনই হাত বা পা নড়িয়া উঠে। এই বিশেষ প্রক্রিয়াটির নাম প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু কেবলমাত্র ঘুমন্ত

অবস্থাতেই হয় না—জাগ্রত অবস্থাতেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া হয়। যেমন হাতে গরম বস্তুর ছোঁওয়া লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা হাত গুটাইয়া থাকি, এবং তাহার কিছুক্ষণ বাদে যন্ত্রণা বোধ হয়। এই প্রকার বোধশক্তি হইবার আগেই কোন ক্রিয়া হইয়া যাওয়া মানেই মস্তিষ্কে খবর পৌছিবার আগেই সুষুম্নাকাণ্ড হইতেই হুকুম চলিয়া গিয়াছে এবং তদনুসারে কাজ হইয়াছে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড ছাড়াও আর এক প্রকার নার্ভ আছে। উহারা মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে। এই নার্ভরা একটি স্বতন্ত্র নার্ভমণ্ডল গঠন করে, এবং স্বাধীনভাবে পাচনতন্ত্র, রক্ত-সঞ্চালনতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্র
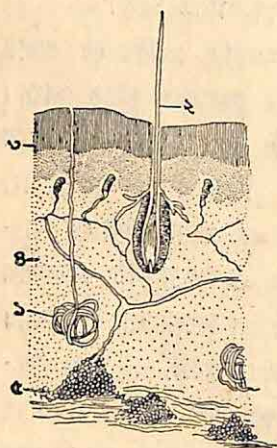
চামড়ার ছেদ
১—ঘর্মগ্রন্থি ; ২—চুল; ৩—উপচর্ম; ৪—প্রকৃত চর্ম ; ৫—মেদ।

যে যন্ত্রগুলির দ্বারা দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যতীত অন্যান্য দূষিত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায় তাহাদের সমষ্টির নাম রেচনতন্ত্র। দেহের কোষে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ গুলির বেশীরভাগ অংশ রক্ত স্রোতের সহিত বৃক্ক নামক যন্ত্রে আসে। এখানে দূষিত পদার্থগুলি রক্ত হইতে আলাদা হইয়া মূত্রে পরিণত হইয়া মূত্রাশয়ে জমা হয়। মূত্রাশয়টি ভর্তি হইলে উহা মূত্রপথ দিয়া আসিয়া মূত্রদ্বার দিয়া বাহির হয়। দূষিত পদার্থ ঘামেরও সহিত বাহির হয়। রক্তের দূষিত পদার্থ চামড়ার ঘর্মগ্রন্থিতে

ছাঁকিয়া ঘাম হিসাবে দেহ হইতে বাহির হয়। ঘর্মগ্রন্থিগুলি ছোট ছোট পুঁটুলীর মত। ইহাদের বিশেষ উপায়ে চামড়া কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিতে হয়। প্রত্যেকটি ঘর্মগ্রন্থি, ঘর্মনালী ও ছিদ্রপথের দ্বারা বাহিরের সহিত সংযুক্ত থাকে।

যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে মানব-শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহাদের সমষ্টিকে জননতন্ত্র বলে। স্ত্রী ও পুরুষের দেহে বিভিন্ন প্রকারের জননযন্ত্র থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের অদৃশ্য শত্রু ও তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়

আমাদের চারিদিকেই নানা প্রকার শত্রু দেখিতে পাই। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হইলে অনেক সময় সে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। স্বার্থের খাতিরে লোক লোকের শত্রু হয়। হিংস্র জীবজন্তু, সাপ প্রভৃতি মানুষের শত্রু। আবার প্রকারান্তরে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বন্যা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিও মানুষের শত্রুতা করে। কিন্তু ইহাদের অপেক্ষাও অনেক বড় শত্রু আমাদের অগোচর থাকিয়া কত যে সর্বনাশ করে তাহা আমরা জানিতে পারি না। এই সব অদৃশ্য শত্রুরা খুব ছোট—এত ছোট যে ইহাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখিতেই পাওয়া যায় না। ইহাদের বলা হয় জীবাণু। আমাদের বেশির ভাগ রোগের কারণ এই জীবাণু। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লু য়েঞ্জা

প্রভৃতি রোগ এই জীবাণুদের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। অবশ্য সব জীবাণু যে রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে। এমন অনেক জীবাণু আছে যাহারা নানা ভাবে আমাদের উপকার করে —এমন কি দুঃসাধ্য রোগও সারাইতে সাহায্য করে। জীবাণুরা পরভোজী। অর্থাৎ ইহারা নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে না, অন্যের দেহ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। ইহাদের প্রধানতঃ রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ও সাধারণ জীবাণু এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
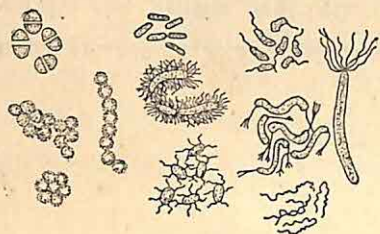
বিভিন্ন প্রকার জীবাণু

জীবাণুদের সাধারণতঃ চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । এককোষী প্রাণীর ভিতর এণ্ট্যামিবা হিসটোলেটিকা বলিয়া অ্যামিবা জাতীয় প্রাণী, ম্যালেরিয়ার জীবাণু, ঘুমজ্বর, কালাজ্বর প্রভৃতির জীবাণুরা প্রাণীজ জীবাণুর অন্তর্গত।

কলেরার জীবাণু, যক্ষার জীবাণু, নিউমোনিয়ার জীবাণু প্রভৃতি ব্যাক্‌টেরিয়া নামক এককোষী জীবের অন্তর্গত। কাহার কাহার মতে ব্যাক্‌টেরিয়ারা উদ্ভিদেরই একটি শ্রেণী। দাদ প্রভৃতির জীবাণুরা ছত্রাক শ্রেণীর উদ্ভিদের ভিতর পড়ে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত প্রভৃতির জীবাণুরা অত্যন্ত ছোট। তাহাদের সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও দেখা যায় না— কেবল মাত্র ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোসকোপ নামক জটিল যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের দেখা যায়। ইহাদের নাম ভাইরাস। অনেক সময় প্রাণীজ জীবাণুদের জীবাণু, এবং ব্যাক্‌টেরিয়া, ছত্রাক ও ভাইরাসদের একসঙ্গে বীজাণু বলা হয়।

জীবাণুদের ভিতর ব্যাক্‌টেরিয়ারা আবার দুইপ্রকার। একদল বায়ু

না থাকিলে বাঁচে এবং নিজ দেহ হইতে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য বাহির করিয়া যে বস্তুতে জন্মায় তাহাকে ভাঙ্গিয়া নিজ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জোগাড় করিয়া লয়। ইহাদের অবায়ুজীবি জীবাণু বলা হয়। আর একদল জীবাণু বায়ু বা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচিতে পারে না। তাহাদের বায়ুজীবি জীবাণু বলা হয়।

প্রতি মিনিটে আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে হাজার হাজার জীবাণু গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের সকলের রোগ জন্মাইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা যাহার নাই বা যাহার কমিয়া গিয়াছে তাহাকেই রোগ আক্রমণ করে।

বেশির ভাগ সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের প্রথম আক্রমণের ফলেই শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতা এতদূর বাড়িয়া যায় যে, দ্বিতীয়বার শরীরে ঐসব রোগের বীজ প্রবেশ করিলে তখন বিশেষ কিছু নাও হইতে পারে। অনেক দিন আগে যখন জীবাণু কি এবং কিরূপ দেখিতে তাহা জানা ছিল না, তখনও লোকে এই তথ্যটি জানিত। লিউয়েনহক নামক এক ব্যক্তির দ্বারা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণু আবিষ্কার হওয়ার পর জীবাণুতত্ত্বের আলোচনা বাড়িয়া গেল। ক্রমে প্রমাণিত হইল যে যদি অল্প মাত্রায় বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতির জীবাণু সুস্থলোকের দেহে ঢুকাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার ছোট খাট রকমের কৃত্রিম রোগ হইবে কিন্তু তাহার ভীষণতা থাকিবে না। এবং পরে তাহার ঐ রোগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর হইবে না। বসন্ত লইয়া খুব গবেষণা চলিল, কিন্তু দেখা গেল এই প্রথা সব সময় নিরাপদ নহে—মাঝে মাঝে এইরূপ জীবাণু প্রবেশ করানর ফলে মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। আমাদের দেশের বাংলা টীকা এই প্রথারই অঙ্গ ছিল। ইহাতে বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গুটি হইতে পুঁজ লইয়া সুস্থ লোকের

গায়ে ঢুকাইয়া দেওয়া হইত। ইংরাজীতে এই প্রথার নাম ছিল ইনোকুলেশন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ডাঃ জেনার এক নূতন প্রথার প্রবর্তন করেন। গো-বসন্ত মানুষের আসল বসন্তের মৃদু সংস্করণ, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি গো-বসন্তের গুটি হইতে পুঁজ ও রস লইয়া পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কেহ তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর না হওয়ায় তিনি নিজের ছোট ছেলের উপর পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য হইলেন। ইহার পর হইতে গো-বসন্তের বীজ-রস কাঁচনলে বদ্ধ করিয়া চারিদিকে চালান দিবার ব্যবস্থা হয়। ডাঃ জেনারের নামে ধন্য ধন্য রব উঠিতে থাকে। যে প্রথা তিনি আবিষ্কার করেন তাহাকে পরে সামান্য পরিবর্তন করা হয়। পরবর্তী কালে বসন্তের বীজাণুদের মারিয়া গ্লিসারিণ নামক দ্রব্যে গুলিয়া ব্যবহৃত হইতে থাকে। বীজাণু মারিয়া সেই মৃত বীজাণুদের শরীরে প্রবেশ করানর নাম হইল ভ্যাক্সিনেশন এবং গ্লিসারিণে রাখা গোবসন্তের বীজ ও রস 'ভ্যাক্‌সিন লিম্ফ' নামে পরিচিত হইল। ক্রমে ক্রমে প্রায় সব রোগের ভ্যাক্‌সিন তৈয়ারী করিবার প্রচেষ্টা চলিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কক্‌ ও লুইপাস্তরের আপ্রাণ চেষ্টায় কলেরা, অ্যানথ্রাক্স প্রভৃতি রোগের টীকা বাহির হইল। শুধু তাহাই নহে, দেখা গেল যে কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হইবার পর যদি সেই রোগের জীবাণু হইতে প্রস্তুত ভ্যাক্সিন দেওয়া যায় তাহা হইলেও উপকার হয়।

ডাঃ জেনার

অনেকক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সব জীবাণু হইতে ভ্যাক্সিন সাধারণ

নিয়মে প্রস্তুত করা যায় না। তখন পরীক্ষা করিয়া স্থির করা হইল যে, বিশেষ বোতলে রোগ জীবাণুর চাষ করিয়া সেই জীবাণুকে মারিয়া বা নিষ্ক্রিয় করিয়া গ্লিসারিণে পরিমাণ মত মিশাইয়া লইলে ভাল ভ্যাক্সিন তৈয়ারী হয়—এই উপায়ে টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতিরও ভ্যাক্সিন তৈয়ারী হইল।

লুই পাস্তর

ধনুষ্টংকার, মেনিনজাইটিস, জলাতক প্রভৃতি রোগে দেখা গেল যে ভ্যাক্সিনে কোন কাজ হয় না। কিন্তু তাহাতে বৈজ্ঞানিকেরা বসিয়া থাকিলেন না। অদৃশ্য শত্রুদের জয় করিবার জন্য তাঁহারা অল্প অল্প করিয়া রোগের জীবাণু ঘোড়া বা কোন জন্তুর গায়ে ঢুকাইয়া দিতে লাগিলেন। সেই জন্তুটির রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মাইলে তাহার দেহ হইতে কিছু রক্ত বাহির করিয়া লইলেন। সেই রক্ত হইতে কঠিনাংশ

বাদ দিয়া রক্তমণ্ডটি লইয়া পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, উপযুক্ত ফল পাওয়া যাইতেছে। এই উপায়ে প্রস্তুত প্রতিষেধকটির নাম হইল সিরাম।

আজকাল যক্ষার জীবাণু লইয়াও পরীক্ষা চলিতেছে এবং উহা হইতে বি, সি, জি টীকা বলিয়া একপ্রকার টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই টীকা কেবল মাত্র খুব ছোট শিশুর পক্ষে কার্যকরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কয়েকটি সাধারণ ব্যাধি

ম্যালেরিয়া

বর্ষার পর হইতে বাংলার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আরম্ভ হয়। এই রোগের মূল কারণ দুইটি—একটি জীবাণু ও অন্যটি অ্যানোফিলিস মশা। মশার কামড়ের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার যে জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে তাহারা দেখিতে সরু সরু লম্বাটে। ইহারা দেহে ঢুকিয়া লাল রক্ত-কণিকার ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা গোল গোল দেখিতে হয়। প্রতিটি জীবাণু প্রতিটি কণিকার সার পদার্থ খাইয়া বড় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতর একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ নিজ দেহ হইতে ছাড়িয়া দেয়। তাহার পর আপনার দেহ নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রায় কুড়িটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। এই সময় রক্তকণিকাগুলি

ফাটিয়া যায়। এবং তাহার ফলে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি রক্তরসে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ আবার একটি করিয়া লাল রক্ত-কণিকা আক্রমণ করিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া যায় এবং সেই স্থানে বড় হইয়া আবার আগের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। লাল রক্ত-কণিকার ভিতর ঢুকিয়া পুনরায় সেখান হইতে বিভক্ত হইয়া বাহির হইতে ম্যালেরিয়া জীবাণুর দুই বা তিন দিন সময় লাগে। ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন ইতিহাসের যে অংশটি এইভাবে মানুষের দেহের ভিতর ঘটিতে থাকে তাহাকে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনেতিহাসের মানবচক্র বলা হয়। রক্তকণিকা ফাটিয়া যখন জীবাণু খণ্ডগুলি রক্তরসে ছড়াইয়া পড়ে সেই সময় তাহাদের দ্বারা কণিকাগুলির ভিতর তৈয়ারী বিষাক্ত পদার্থটিও রক্তরসে মিশিয়া যায়। এই বিষাক্ত পদার্থটিই রোগীর দেহে কম্প দিয়া জ্বর আনে। খণ্ড অংশগুলি পুনরায় রক্ত কণিকার ভিতর ঢুকিলে আবার জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। ঐগুলি আবার যখন রক্তকণিকা হইতে রক্তরসে ছড়াইয়া পড়ে তখন আবার জ্বর আসে। এইভাবে ক্রমাগত লাল রক্ত কণিকা নষ্ট হওয়ার ফলে শীঘ্রই রোগীর দেহের রক্ত কমিয়া যায় এবং রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়।

মানুষের দেহে কিন্তু জীবনেতিহাসের এই অংশটি একই ভাবে বেশি দিন চলে না। কিছুদিন মানবচক্র চলিবার পরই জীবাণুগুলির কিয়দংশ আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পুনরায় বিভক্ত হয় না, বরং তাহার বদলে গোলাকার অবস্থা হইতে অর্ধচন্দ্রের মত দেখিতে হইয়া ঐ অবস্থাতেই রক্ত কণিকার ভিতর প্রায় সুপ্তাবস্থায় বাস করিতে থাকে। এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি অবস্থার মানবদেহে আর কোন পরিবর্তন নাই। একমাত্র মশার দেহে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহাদের পরিবর্তন পুনরায় লক্ষ্য করা যায়। মশার দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনেতিহাসের যে অধ্যায়টি সম্পূর্ণ হয় তাহাকে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনেতিহাসের মশকচক্র বলা হয়।

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা রক্ত খাইবার জন্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে কামড়াইলে সেই রক্তের সহিত কিছু ম্যালেরিয়ার জীবাণু তাহার পাকস্থলীতে চলিয়া যায়। জীবাণুগুলির ভিতর যেগুলি অর্ধচন্দ্রাকৃতির সেইগুলির মধ্যে কিছুটা স্ত্রী-জীবাণু ও কিছুটা পুং-জীবাণুতে পরিবর্তিত হয়। এই দুই প্রকার জীবাণুর মিলনের ফলে এক প্রকার কোষ তৈয়ারী হয়। এই কোষগুলি প্রথমে গোল থাকে, পরে ঈষৎ লম্বাটে হইয়া মশার পাকস্থলীর গাত্র ফুটা করিয়া লালা গ্রন্থিতে উপস্থিত হয়। সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রতিটি ঈষৎ লম্বাটে কোষ অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সরু সরু লম্বা লম্বা আকারের বহু জীবাণুতে পরিণত হয়। সেই সময় যদি মশা কোন সুস্থ লোককে কামড়ায় তাহা হইলে তাহার দেহে ঐ জীবাণুগুলি ঢুকিয়া পড়ে। মানুষের দেহে জীবাণু ঢুকিবার ব্যবস্থাও বড় চমৎকার। মশাটি রক্ত খাইবার জন্য যখন হুল ফুটাইয়া দেয় তখনি যাহাতে রক্ত না জমিয়া যায় সেইজন্য খানিকটা লালা দেহের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়, এবং তাহার পর রক্ত চুষিতে থাকে। রক্ত চোষা কিন্তু একটানা হয় না। খানিকটা রক্ত চোষার পর মশাটি আবার খানিকটা লালা প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে বারবার লালা প্রবেশ করায় উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবগুলি জীবাণুই মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এইবার পুনরায় মানবচক্র আরম্ভ হয়। মানবচক্র ও মশকচক্র এই দুই লইয়াই ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনেতিহাস।

মশা না কামড়াইলে ম্যালেরিয়া হইতে পারে না। ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে এইরূপ মশা একজন ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইলে রক্তের সহিত রোগীর শরীরের জীবাণু মশার দেহে যাইবে এবং সেইখানে বংশ বৃদ্ধি করিবে। এই অবস্থায় সেই মশাটি যদি কোন সুস্থ লোককে কামড়ায় তাহা হইলে উহার দেহ হইতে জীবাণুগুলি সুস্থ লোকের দেহে ঢুকিবে। ম্যালেরিয়া জীবাণু তিন প্রকার এবং তাহারা বিভিন্ন তিন

প্রকার জ্বরের জন্য দায়ী। এক প্রকার জীবাণুর মানবচক্র একদিন অন্তর পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকার জীবাণুর মানবচক্র পূর্ণ হইতে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় লাগে। সুতরাং তাহাদের দ্বারা তিন দিনের দিন পুনরায় জ্বর আসে। তৃতীয় প্রকার জীবাণুর দ্বারা আনীত জ্বর সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। এই জীবাণুর আক্রমণে প্রায় প্রতিদিন জ্বর হয় এবং তাহার উত্তাপও খুব বেশী থাকে। এই প্রকার ম্যালেরিয়াকে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্‌ ম্যালেরিয়া বলে। এই রোগে খুব শীঘ্র এবং সাবধানতার সহিত চিকিৎসা না করিলে প্রাণ সংশয় হইবার সম্ভাবনা বেশী।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রথম আবিষ্কার করেন ল্যাভেরাণ নামে একজন বৈজ্ঞানিক। মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া জীবাণু এক দেহ হইতে আর এক দেহে বাহিত হয় ও মশার দেহে তাহার জীবনেতিহাসের শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়—এই সত্য আমাদের কলিকাতার বুকে বসিয়াই খুঁজিয়া পান রোনাল্ড রস নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক। ইতিহাসের পাতায় এই দুইজনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যদিও রোনাল্ড রসের বহু শত বৎসর পূর্বে লিখিত আমাদের দেশেরই চরক-সংহিতায় ম্যালেরিয়ার বাহন যে মশা এই খবর দেওয়া আছে, তবুও যে আন্তরিক সদিচ্ছা ও পরিশ্রমের ফলে রোনাল্ড রস মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয় এই তথ্যটি পুনরাবিষ্কার করেন এবং প্রমাণিত করেন তাহা বৃথা যাইবার নহে।

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশারাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। অবশ্য সব অ্যানোফিলিস মশারাই ম্যালেরিয়ার কারণ তাহা নহে—মাত্র কয়েক জাতীয় মশারাই রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী।

বিভিন্ন প্রকার মশা হইতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বাহক মশা চিনিবার উপায়—এই জগতে নানা জাতীয় মশা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স ও ষ্টেগোমায়া

জাতীয় মশারাই উল্লেখযোগ্য। কয়েক শ্রেণীর অ্যানোফিলিস মশারা ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী। কিউলেক্স গোদের কীট ও ষ্টেগোমায়া ডেঙ্গুজ্বরের বীজাণু বিস্তার করে। এই তিন শ্রেণীর মশারাই জলে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফোটার পর তাহাদের শূককীট বা লার্ভা অবস্থা এবং মূককীট বা পিউপা অবস্থা জলেই কাটে। পূর্ণাঙ্গ মশারা স্থলে থাকে এবং ডানার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায়। আমাদের দেশে অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশারাই প্রধান, সেইজন্য নিম্নের ছকে কি কি লক্ষণ দেখিয়া তাহাদের চেনা যায় সেই বিষয়গুলি দেওয়া হইল।

অ্যানোফিলিস	কিউলেক্স
১। সাধারণতঃ পরিষ্কার জলে ডিম পাড়িতে পছন্দ করে।	১। সকল প্রকার জলেই ডিম পাড়ে, বদ্ধ ও পচা জল হইলেও ডিম পাড়িতে আপত্তি নাই।
২। ডিমগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রায়ই আলাদা আলাদা ভাবে জলে ভাসে।	২। ডিম সামান্য বড় এবং ঐগুলি একসঙ্গে জড়ো হইয়া ভেলার মত ভাসিয়া বেড়ায়।
৩। শূককীটগুলি জলের ঠিক নীচে জলরেখার সহিত সমান্তরালভাবে শুইয়া থাকে।	৩। শূককীটগুলি মাথা নীচু করিয়া জলরেখার নীচে কোণাকুণি অবস্থায় শুইয়া থাকে।
৪। পূর্ণাঙ্গ মশা আকারে সামান্য ছোট। ইহাদের ডানায় ছোট ছোট ফুটকির মত দাগ ও পায়ে সাদা কালো ডোরা কাটা থাকে। হুলের দুই পাশে দুইটি লম্বা শুঁড় থাকে। পূর্ণাঙ্গ মশা যখন কোথাও বসে	৪। পূর্ণাঙ্গ মশার আকার সামান্য বড়। ইহাদের ডানায় দাগ বা পায়ে ডোরা কাটা নেই। শুঁড় অতি ছোট, প্রায় নাই বলিলেই হয়। পূর্ণাঙ্গ মশা যখন কোথাও বসে তখন সামনের দিকে ঈষং ঝুঁকিয়া

তখন পশ্চাদ্ভাগ সটান উঁচু করিয়া বসে। সুতরাং সেই স্থানের সহিত দেহের একটি কোণ সৃষ্টি হয়।

এবং বাকী অংশটুকু সেই স্থানের সমান্তরাল রাখিয়া বসে।
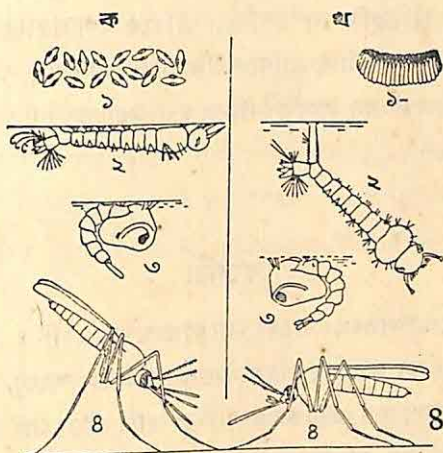
মশার জীবন ইতিহাস

ক—অ্যানোফিলিস ; খ—কিউলেক্স।

১—ডিম ; ২—লার্ভা বা শূককীট ; ৩—পিউপা বা মূককীট ; ৪—পূর্ণাঙ্গ মশা।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ ও প্রতিকার—ম্যালেরিয়া জ্বর শীত করিয়া এবং খুব কম্প দিয়া আসে। এই রোগে জ্বর খুব বেশি ওঠে এবং সময় সময় রোগী জ্বরের ঘোরে ভুলও বকে। অনেক সময় রোগী বমি করে এবং বেশি জ্বর হইলে অজ্ঞান হইয়া যায়। এই রোগের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে প্রথমতঃ ডাক্তারের পরামর্শ মত কুইনিন, প্যালুড্রিন, মেপাক্রিন বা ঐ জাতীয় ঔষধের দ্বারা রোগ সারাইবার ব্যবস্থা

করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ মশারি, ধূপ-ধূনা জ্বালান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়া রোগবাহক মশার হাত হইতে আত্মরক্ষা করা এবং তৃতীয়তঃ ডি. ডি. টি. প্রভৃতির কীটঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বা অন্য উপায়ে মশার বংশ ধ্বংস করা প্রয়োজন। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রাখিলে এবং বাড়ীর কাছে ভাঙ্গা হাঁড়িকুড়ি না ফেলিয়া রাখিলে মশা জন্মাইতে পারে না। পচা পুকুর, নর্দমা, ডোবা ইত্যাদিতে নিয়মিত প্যারিসগ্রীন, কেরোসিন তেল, প্যারাফিন অয়েল প্রভৃতি ঢালিলে মশা জন্মাইতে পারে না।

কলেরা

বাংলাদেশে কলেরা রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। এই রোগের জীবাণু রোগীর মল ও বমির সহিত দেহের বাহিরে আসে, এবং কোন রকমে যদি পুকুর, কূপ প্রভৃতির জলে মিশে তাহা হইলে সেই জলে ক্রমাগত বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। কলেরার জীবাণু জলের দ্বারা সুস্থ লোকের দেহে ঢোকে। সুতরাং ঐ দূষিত জল ব্যবহারে কলেরা হইবার আশঙ্কা খুব বেশি। রোগীর বমি ও মলের উপর মাছি বসিলে তাহা তাহার লোমশ পায়ে লাগিয়া যায়। পরে খাদ্যদ্রব্যে বসিলে সেইগুলি ঐ বমি ও মলের কণা লাগিয়া জীবাণু দুষ্ট হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে। জীবাণুদুষ্ট খাবার খাইয়া লোকেরা কলেরা রোগগ্রস্ত হয়।

আমাদের দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব সাধারণতঃ আশ্বিন-কার্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ-মাঘ মাস পর্যন্ত, এবং চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত হয়। গরম কালে কলেরার প্রকোপ বেশি হয় ও সময় সময় মারী আকারে দেখা দেয়। এই দুই সময় ছাড়াও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কলেরার আক্রমণ প্রায় সব সময়েই ঘটিয়া থকে।

কলেরার লক্ষণ ও প্রতিকার—কলেরা রোগে বার বার দাস্ত হইতে থাকে এবং উহার চেহারা ক্রমে সাবান গোলা জলের মত হয়। দাস্তের সহিত বমিও হয়। শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া হাতে পায়ে খিল ধরা আরম্ভ হয়। ক্রমে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া শরীরে বিষক্রিয়া হইতে থাকে। ঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিলে রোগীকে বাঁচান কঠিন। যথাসময়ে ডাক্তার ডাকা, রোগীর হৃৎস্পন্দন যাহাতে বন্ধ না হয় সেই জন্য কোরামিন প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা করা, রোগীর হাতে পায়ে গরম জলের বোতল দিয়া সেঁক দেওয়া, সালফা গুয়েনডিন প্রভৃতি ঔষধ খাওয়ান এবং বিশুদ্ধ নুনজল বা স্যালাইন ইন্‌জেকশন দিবার বন্দোবস্ত ঠিক সময়ে না করিলে রোগীর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় খুব সাবধানে থাকার প্রয়োজন। জল, ধূলা ও মাছির দ্বারাই এই রোগের বিস্তার হয় বলিয়া ঐ সময় বাজারের খাবার, পচা মাছ, যেখান সেখানকার জল, বরফ, বাজারের কাটা ফল প্রভৃতি খাওয়া একেবারে বন্ধ রাখা উচিত। বাড়ীতেও খাবার দাবার ঢাকা দিয়া রাখা প্রয়োজন। মাছি একেবারেই যাহাতে বসিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। শহরে কলের জল ফুটাইয়া খাওয়া এবং গ্রামে নদী-পুকুর বা ইঁদারার জলে ব্লিচিং পাউডার, পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট প্রভৃতি মিশাইয়া এবং পরে ফুটাইয়া খাওয়া উচিত। খাবার ফুটাইয়া গরম অবস্থায় খাওয়ারও প্রয়োজন। কলেরার সময় পেট খালি রাখা ভাল নহে। রোজ একটু করিয়া অম্ল দ্রব্য খাইলে ভাল হয়। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন ছয় মাস অন্তর কলেরার টীকা লওয়া।

বাড়ীতে অথবা পাড়ায় কাহারও কলেরা হইলে তাহাকে খুব সাবধানে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। রোগীর মলমূত্র প্রভৃতি কার্বলিক অ্যাসিড, লাইসল, ডেটল, ফিনাইল প্রভৃতিতে ভাল ভাবে ডুবাইয়া পরে

ধুইয়া লওয়া বা একেবারে পুড়াইয়া ফেলা উচিত। অজ্ঞতার বশে লোকে গ্রামের পুকুর, জলাশয় প্রভৃতিতে যাহাতে কলেরা রোগীর কাপড় না কাচে বা মল-মূত্র বমি না পরিষ্কার করে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আন্ত্রিক জ্বর বা টাইফয়েড

এই রোগের কারণ একপ্রকার জীবাণু বা ব্যাসিলি, সেই জীবাণু খাদ্য এবং পানীয়ের মধ্য দিয়া সংক্রামিত হয়। জীবাণু পেটের ভিতর ঘা করিয়া দেয় তাহার ফলে জ্বর হয়। ঠিক মত চিকিৎসা না হইলে রোগীর জীবননাশের আশঙ্কা থাকে। টাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ চৌদ্দ, একুশ ও আঠাশ দিন থাকে। সময় সময় তিন মাস পর্যন্ত এর জের চলে। এই রোগে জ্বরের সহিত পেট ফাঁপা, বুকে সর্দি বসা, পেট খারাপ হওয়া, মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এই রোগে অনেক সময় মলের সহিত রক্ত পড়ে। জীবাণুর দ্বারা ঘা হইবার ফলে অন্ত্রের গা ফুটা হইয়া গেলেই রক্ত পড়িবার আশঙ্কা থাকে। মলের সহিত রক্ত বাহির হইলে বুঝিতে হয় রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। টাইফয়েড ঔষধের সহিত শুশ্রূষারও প্রয়োজন খুব বেশি। ভালভাবে সেবা না হইলে রোগীকে বাঁচান যায় না। টাইফয়েড ছাড়াও প্যারাটাইফয়েড বলিয়া সমশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত কম সাংঘাতিক এক প্রকার রোগও দেখা যায়।

টাইফয়েডের লক্ষণ ও তাহার প্রতিকার—এই রোগের আক্রমণ হইলে প্রথমে মাথাধরা সহ জ্বর হয়। জ্বরের তীব্রতা কোন কোন ক্ষেত্রে খুব বেশি আবার কখনও কম থাকে। জ্বর একেবারে ছাড়িয়া যায় না, তবে সারা দিনে একবার অন্ততঃ কম থাকে। এইরূপ কমা-বাড়া বিশিষ্ট জ্বর টাইফয়েডের প্রধান লক্ষণ।

এই রোগ ধরিতে হইলে রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। অনেক সময়

রোগের প্রথম সপ্তাহে রক্ত পরীক্ষায় কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে রক্ত পরীক্ষা করিলে বোঝা যায় টাইফয়েড হইয়াছে কিনা। টাইফয়েড রোগে পেট ফাঁপা, পেট খারাপ হওয়া, ভুল বকা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি উপসর্গ অত্যন্ত খারাপ। এই রোগে রোগীকে চুপ চাপ শোয়াইয়া রাখা কর্তব্য। নড়াচড়া, হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া কিম্বা বাজে জিনিষ খাওয়া একেবারে বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত খাবার বন্ধ রাখিয়া কেবলমাত্র শরীর রক্ষার্থে অল্প করিয়া ছানার জল. ডাবের জল, গ্লুকোজ মিশ্রিত জল, কমলালেবু বা বেদানার রস, পাতলা করিয়া হরলিক্স প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। জ্বর ছাড়িয়া যাইবার পরও বেশ কিছু দিন ভাত বা অন্য খাদ্য দেওয়া উচিত নয়; কারণ তাহাতে পুনরাক্রমণ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। আস্তে আস্তে দুধ-বার্লি, দুধ, সুরুয়া, ভাতের মণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে করিতে পরে ভাত দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্বে টাইফয়েডের বিশেষ কোন চিকিৎসা ছিল না। ডাক্তাররা চেষ্টা করিতেন অন্যান্য উপসর্গগুলি দূর করিয়া এবং উপযুক্ত শুশ্রূষার দ্বারা রোগীকে নিরোগ করিতে। বর্তমানে আগেকার দিন অপেক্ষা অনেক সুদিন আসিয়াছে। এখন ক্লোরোমাইসিটিন নামে ছত্রাক হইতে প্রস্তুত যে ঔষধ পাওয়া যায় তাহা টাইফয়েড রোগকে দ্রুত আরোগ্য করিতে পারে। এই ঔষধ ছাড়াও আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ তত্ত্ব-বিদ্ ডাক্তার সহায়রাম বসু একজাতীয় ছত্রাক হইতে পলিপোরিণ বলিয়া যে ঔষধ বাহির করিয়াছিলেন তাহাও বেশ ফলপ্রদ।

কলেরার মত খাদ্য ও পানীয়ের ভিতর দিয়া এই রোগ বিস্তার হয় বলিয়া সব সময় টাটকা খাবার ও ফুটান জল খাওয়া এবং খাদ্যের উপর মাছি যাহাতে না বসে তাহা লক্ষ্য রাখা উচিত। টাইফয়েডের টীকা প্রত্যেকেরই ছয় মাস অন্তর লওয়া কর্তব্য। টাইফয়েড রোগীর সংস্পর্শে

আসিলে বা তাহার ব্যবহৃত বস্তু ছুঁইলে ভাল করিয়া জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়া হাতমুখ ধোয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

বসন্ত

এই রোগ সাধারণতঃ বাতাসের সাহায্যে ছড়াইয়া পড়ে। বসন্ত রোগ দুই প্রকার—পানি বসন্ত ও আসল বসন্ত বা ইচ্ছা বসন্ত। পানি বসন্তের গুটির ভিতর রস, বা জল থাকে, কিন্তু আসল বসন্তের গুটির ভিতর পুঁজ হয়। পানি বসন্ত আসল বসন্তের মত মারাত্মক নহে। এবং ইহাতে অল্পদিন ভুগিতে হয়। আসল বসন্ত মারাত্মক রোগ, ইহার মৃদু আক্রমণেও খুব কষ্ট দেয় এবং সারা দেহে ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া যায়। বসন্তের ফলে অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি অন্ধও হইয়া যায়।

বসন্ত রোগের লক্ষণ ও তাহার প্রতিকার—বসন্ত রোগের সূচনায় সর্বাঙ্গ ব্যথা করিয়া ও মাথা ধরিয়া জ্বর আসে। গা, হাত, পা প্রভৃতিতে তীব্র বেদনা, দেহের অত্যন্ত বেশী উত্তাপ বৃদ্ধি ও চোখ মুখাদির রক্তিমাভা আসল বসন্ত রোগের প্রধান লক্ষণ। এইরূপ অবস্থায় দিন তিনেক থাকার পর রোগীর সর্বদেহে ফোড়ার মত গুটি বাহির হয়। গুটিগুলি খুব চুলকাইতে থাকে এবং কয়েক দিনের ভিতর গুটিগুলি পাকিয়া ওঠে ও উহাদের ভিতর পূঁজ জন্মায়। এই সময় মনে হয় যেন সারা দেহটি পচিয়া গিয়াছে। ঘা হইতে দুর্গন্ধও বাহির হইতে থাকে। ঘা যদি বিষাইয়া না যায় তাহা হইলে গুটিগুলি শুকাইতে থাকে এবং তাহাদের উপর শুক্না ছালের মামড়ী বা চুম্‌টি পড়ে। সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে মাম্‌ড়ি ঝরিতে থাকে এবং বিশ্রী ক্ষত চিহ্ন রাখিয়া রোগ চলিয়া যায়। অনেক সময় বসন্তের গুটি বাহির হয় না, দেহের ভিতরেই বসিয়া যায়। এইরূপ অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক। উপযুক্ত ঔষধ বা আমাদের দেশী মতে মেথি ভিজান জল প্রভৃতি খাওয়ান সত্ত্বেও গুটিগুলি যদি বাহির না হয়
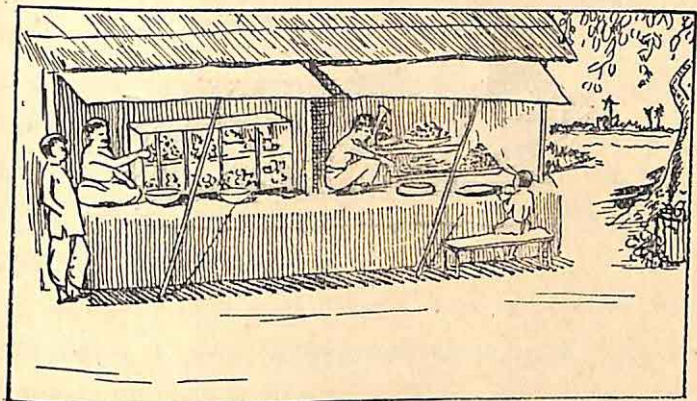
বাজারের খাবার হইতে কলেরা রোগের বিস্তার হইতে পারে

খাবার ঢাকা থাকিলে মাছি বসিতে পারে না

খোলা খাবারে মাছি বসে
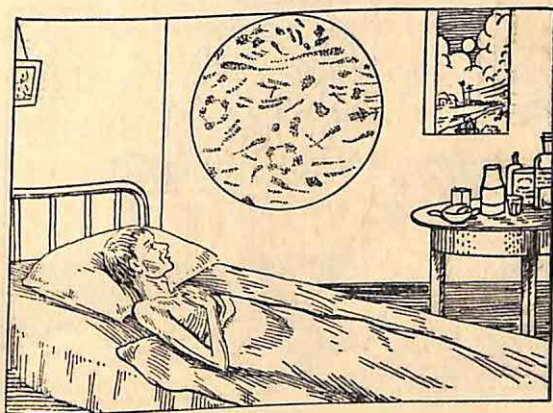
কলেরা রোগী

গোল দাগের ভিতর কলেরার জীবাণু দেখানো হইয়াছে
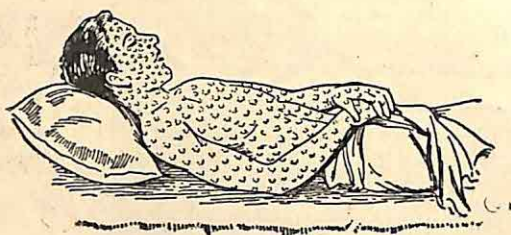
বসন্ত রোগী
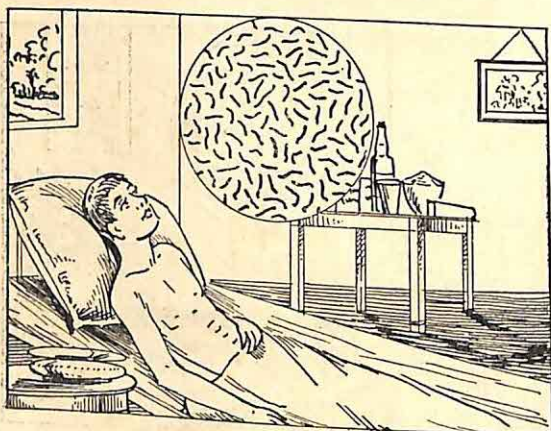
যক্ষ্মা রোগী

গোল দাগের ভিতর যক্ষ্মার জীবাণু দেখান হইয়াছে

তাহা হইলে জীবনের আশা থাকে না। দেহাভ্যন্তরে পৌষ্টিকনালী ও অন্যান্য যন্ত্রে গুটি বাহির হইয়া সময় সময় তাহাদের প্রদাহের কারণ হয়। এইরূপ প্রদাহ অত্যন্ত মারাত্মক। গুটি পাকিবার কালে বা কিছু পরে অনেক সময় চুলকানির ফলে বা অন্য কোন কারণে ঐগুলি গলিয়া যায়। যদি কোন কারণে গলিয়া যাইবার ফলে ঐগুলি বিষাইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বিষ সারা দেহে ছড়াইয়া পড়ে ও দেহের রক্ত দূষিত করিয়া দেয়। এই অবস্থাও খুব মারাত্মক।

বসন্ত রোগের কোন বিশেষ চিকিৎসা নাই। জ্বরের উত্তাপ খুব বেশি বাড়িতে না দেওয়া, নিয়মিত পেট পরিষ্কার রাখা, গুটি না বাহির হইলে তাহা বাহির করিবার ব্যবস্থা করা, গুটিগুলি যাহাতে বিষাইয়া না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা এবং বিষাইবার উপক্রম হইলে বিষঘ্ন ঔষধ ব্যবহার করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। সময় সময় গুটিগুলির প্রদাহ খুব বেশী হইলে তাহাদের উপর চন্দন বাটিয়া মাখাইয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় শরীরের প্রদাহ কিছুটা কমে মাত্র এবং চন্দন বাটা গুটিগুলির উপর লাগিয়া থাকার ফলে হঠাৎ কিছুর সংস্পর্শে আসিয়া বিষাইয়া যাইতে পারে না। আজকাল অনেক ডাক্তার প্রলেপ হিসাবে সালফা-জাতীয় ঔষধের মলম এবং খাইবার জন্যও ঐ জাতীয় ঔষধ দিতেছেন। বসন্ত রোগের সকল ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান হইতেছে রোগীকে পুষ্টিকর অথচ পেট ঠাণ্ডা রাখে এইরূপ খাদ্য দেওয়া এবং তাহাকে ও তাহার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

বসন্ত রোগের কোন বিশেষ চিকিৎসা নাই বলিয়া এই রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে নিয়মিত টীকা লওয়া উচিত। একবার টীকা লইলে দেহে তিন বৎসরের জন্য রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মে, অবশ্য যদি উহা উঠে। টীকা না উঠিলে না ওঠা পর্যন্ত প্রতি বৎসর লওয়া কর্তব্য।

বসন্ত রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। সেইজন্য বসন্ত রোগীকে খুব সাবধানে পৃথক করিয়া রাখা দরকার, এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা না করিয়া রোগীর সংস্পর্শে আসা উচিত নহে। রোগীকে মশারির ভিতর রাখা উচিত।

বসন্ত রোগীর গুটিগুলি শুকাইয়া যখন মাম্‌ড়ি বা চুম্‌টি পড়ে তখন তাহার সহিত জীবাণুর বিস্তার হয়। এই সময় রোগীকে মোটেই এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাকে পৃথক করিয়া রাখা উচিত। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও দ্রব্যাদি পোড়াইয়া ফেলা বা ভাল করিয়া শোধন করাও উচিত। মাম্‌ড়ি বা চুম্‌টিগুলি সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলা বা জীবাণুনাশক ঔষধের লোশনে চুবাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

আমাশয়

আমাশয় রোগ টাইফয়েডের মত সংঘাতিক না হইলেও যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে পেট মোচড় দিয়া বার বার বাহে হয় ও পেট ব্যথা করে। বাহে আম পড়ে। আমাশয় রোগে কখন কখন রক্ত পড়ে ও জ্বর হয়।

আমাশয় রোগ দুই প্রকার—এক প্রকার একজাতীয় ব্যাসিলি নামক জীবাণু হইতে হয়। আর এক প্রকার এণ্ট্যামিবা হিস্টিলিটিকা নামক এককোষী প্রাণীর দ্বারা হয়। দুই প্রকার আমাশয়ের জীবাণুই খাদ্য বা পানীয়ের সহিত আমাদের দেহে প্রবেশ করে। আমাশয় রোগগ্রস্ত লোকের মলের সহিত এই জীবাণুরা বাহির হয় এবং কোনরূপে খাদ্য বা পানীয়ের সহিত মিশিয়া গেলে সেই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের সময় তাহারা সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে।

আমাশয়ের প্রতিকার—রোগীর বার বার পেট মোচড় দিয়া বাহে.

হইলে ও পেট অনবরত ব্যথা করিতে থাকিলে আমাশয় সন্দেহ করিয়া তাহার মল পরীক্ষা করিতে হইবে। মলে যদি আম বা রক্ত থাকে তাহা হইলে আমাশয় সন্দেহ করিতে হইবে। ডাক্তারকে দিয়া তাহার মল পরীক্ষা করাইলে তাহাতে কোন জাতীয় জীবাণু আছে তাহা জানা যাইবে। রোগ নির্ণয় হইলে ডাক্তারের নির্দেশমত চিকিৎসা করাইতে হইবে। সাধারণতঃ ডাক্তাররা সালফা গুয়েনডিন ট্যাবলেট অথবা এণ্টারোভাইও-ফম ট্যাবলেট খাইতে দেন। রোগীর পথ্যও ডাক্তারের নির্দেশমত হইবে। ব্যাসিলি ঘটিত আমাশয় অত্যন্ত মারাত্মক ও সংক্রামক। ঠিকমত চিকিৎসা না হইলে রোগীর প্রাণের আশঙ্কা থাকে।

আমাশয় নিবারণের উপায়—প্রথমতঃ বাড়ীতে কাহারও এই রোগ হইলে তাহাকে পৃথক করিয়া তাহার ব্যবহৃত বাসন-পত্রাদি ও বস্ত্রাদি বীজঘ্ন ঔষধের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হইবে। মলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে বীজঘ্ন ঔষধ ঢালিয়া পায়খানায় ফেলিতে হইবে। মাছি যাহাতে তাহার মলের উপর বসিতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পচা ও বাসি খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং দুধ ও জল ভাল করিয়া ফুটাইয়া খাইতে হইবে। খাদ্য বা পানীয় আঢাকা রাখিলে চলিবে না। রোগীর শুশ্রূষাকারীকে অতি সাবধানে থাকিতে হইবে ও বাড়ীর অন্য কোন জিনিষ ধুইয়া আগে বিশোধক লোশন দিয়া হাত ধুইয়া লইতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

খোস ও পাঁচড়া

খোস ও পাঁচড়া মাকড়শা জাতীয় একপ্রকার পরভোজী প্রাণীর দ্বারা সংঘটিত হয়। ইহারা চামড়ার নীচে সুড়ঙ্গ কাটিয়া বাস করে, ও সেইখানে ডিম পাড়ে। এইজন্য চামড়ার উপর সেই স্থানগুলি ক্রমাগত চুলকাইতে

থাকে। চামড়ার উপর ঘা হয়, এবং এই জন্য ইহাদের চর্মরোগ বলে। খোস ও পাঁচড়া অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। একজনের হইতে আর একজনের খুব সহজেই সংক্রামিত হয়। খোস, পাঁচড়া বা দাদ চুলকাইয়া যে রস নির্গত হয় উহা যদি কোনপ্রকারেঅন্যের গায়ে লাগে তাহা হইলে তাহারও নির্ঘাত ঐ রোগ হইবে। রোগীর নিজের দেহেও এইভাবে ছড়ায়। ক্রমাগত রস লাগিয়া সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া একই বিছানা, তোয়ালে বা গামছা ও কাপড়-চোপড় ব্যবহারের ফলে এই রোগ একজনের হইতে আর একজনের দেহে সহজেই যাইতে পারে।
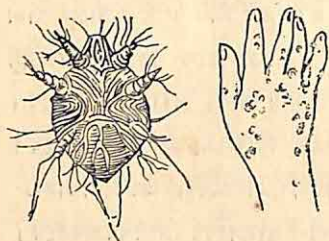
খোস পাঁচড়া

খোস পাঁচড়ার পোকা হাতে পাঁচড়া হয়েছে

খোস ও পাঁচড়ার প্রতিকার—যাহার এই রোগ হইয়াছে তাহাকে অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। যেখানে যেখানে খোস-পাঁচড়া হইয়াছে সেই স্থানগুলি গরম জল ও সাবান দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া গন্ধক-ঘটিত মলম লাগাইতে হইবে। তাহা হইলে খোসের পোকা ও ডিমগুলি মরিয়া যাইবে এবং ধীরে ধীরে ভাল হইবে। খোসপাঁচড়াগ্রস্ত ব্যক্তির কাপড়চোপড়, গামছা, বিছানার চাদর ইত্যাদি পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে ভাল করিয়া গরম জলে ফুটাইয়া লওয়া উচিত। তাহা হইলে এই রোগ আর সংক্রামিত হইবে না।

ক্ষয়রোগ

এই রোগে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে লক্ষাধিক লোক মারা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগের প্রসার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই
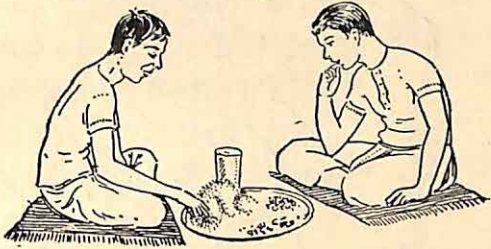
এঁটো খাবারের সঙ্গে যক্ষ্মার বিস্তার হয়

থুথুর সঙ্গে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু ছড়ায়

দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদের এই রোগ হইবার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ পুষ্টিকর খাদ্য, প্রচুর আলোবাতাস ও উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব হইতেই এই রোগের উৎপত্তি। এই সকল অভাবের ভিতর থাকিয়া যাহাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় তাহারাই সচরাচয় ক্ষয় রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সহরের ধূলা, ধোঁয়া, অপর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাসের জন্য গ্রাম অপেক্ষা সহরের লোকদের এই রোগ বেশি হইতে দেখা যায়। সহরে লোকজনের ভীড় খুব বেশি ও নিকটে নানারূপ কল-কারখানা থাকায় বাতাস দূষিত হয়। ইহাতে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি সংক্রামিত হয়। ইহা ব্যতীত সহরে হোটেল, রেস্টুরেন্ট প্রভৃতির অভাব নাই। সুতরাং সেই সব হোটেল, রেস্টুরেন্টগুলির বাসন-পত্রের দ্বারা এক ক্ষয়রোগীর নিকট হইতে জীবাণু অন্য এক সুস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত হয়। বাড়ীতেও অনেক সময় চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিকট আত্মীয় ক্ষয়রোগীর সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়ার ফলে সুস্থ লোকেরও রোগে ধরে। ক্ষয় রোগগ্রস্ত গরুর দুধ পান করিলেও এই রোগ হয়।

ক্ষয়রোগের জীবাণু বাতাস, খাদ্য, পানীয়, জল, দুধ, থুথু প্রভৃতির সঙ্গে দেহের মধ্যে ঢোকে। সময় সময় চামড়ার ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়াও প্রবেশ করে। এই জীবাণুর দ্বারা অন্ত্র, ফুসফুস অস্থি, মস্তিষ্ক, বৃক্ক, গ্রন্থি, প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। ফুসফুসের ক্ষয়রোগের নাম ক্ষয়কাশ বা যক্ষ্মা। ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ও ছোঁয়াচে রোগ।

যক্ষ্মারোগের লক্ষণ—যক্ষ্মারোগের আক্রমণের সূচনায় শরীরে একটি অবসাদ ভাব আসে। বিকালের দিকে জ্বর জ্বর ভাব, চোখ জ্বালা করা, রাত্রিতে হঠাৎ সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া যাওয়া ও রোগা হইয়া যাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য, বদহজম, অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ, অল্প অল্প কাশি ও ঘুষ ঘুষে জ্বর প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। রোগের প্রথম দিকে জীবাণুরা যখন ফুসফুসে বাসা বাঁধে তখন ফুসফুসে ঘা হয় না, কিন্তু একটু পুরান

হইলেই ঘা হইয়া যায় ও তখন কাশির সঙ্গে রক্ত পড়িতে দেখা যায়। ফুসফুস হইতে রক্তের দ্বারা জীবাণু সর্বশরীরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। কফ গিলিয়া ফেলিলে বুক হইতে ঐ জীবাণু অন্ত্রে আশ্রয় লয় ও সেখানেও ঘা করিয়া দেয়।

যক্ষ্মারোগের প্রতিকার—এই রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও কঠিন। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা অসম্ভব। যক্ষ্মা-রোগীকে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যনিবাসে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যনিবাসের সংখ্যা রোগীর তুলনায় অত্যন্ত কম। যক্ষ্মারোগের উপসর্গগুলি প্রকাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ যক্ষ্মারোগ বিশারদ ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া ও রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষা দ্বারা রোগ হইয়াছে কি না ঠিক করা উচিত, এবং হইলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। যক্ষ্মারোগীর হাঁচি, কাশি, থুথু, মল ও এঁটো খাদ্যের সঙ্গে রোগ বিস্তার হয় বলিয়া এইগুলি হইতে সাবধান হওয়া উচিত। রোগীকে একটি উত্তম আলো বাতাসযুক্ত ঘরে একেবারে পৃথক করিয়া রাখা উচিত যাহাতে একসঙ্গে থাকা ও মাখামাখির ফলে অন্যের দেহে এই রোগ সংক্রামিত না হয়।

যক্ষ্মারোগীকে একেবারে শোওয়াইয়া রাখিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য যথা—ডিম, মাছ, মাংস, দুধ, ছানা, মাখন, ফল ইত্যাদি খাওয়ান উচিত। রোগীকে প্রচুর আলোবাতাসের মধ্যে রাখা উচিত, এবং তাহার নিদ্রা ও বিশ্রামেরও একান্ত প্রয়োজন। আজকাল এ, পি, ; থোরাক্সোপ্ল্যাষ্টি ; ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি নানারূপ চিকিৎসার ফলে যথেষ্ট উপকারও হইতেছে।

রোগ সারিয়া যাইবার পরেও অন্ততঃ দুই বৎসর রোগীকে খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। প্রচুর বিশ্রাম, সামান্য পরিশ্রম, পুষ্টিকর খাদ্য, প্রচুর আলো-বাতাস, কডলিভার অয়েল, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি তাহার

একান্ত প্রয়োজন। তাহাকে সব সময়ে প্রফুল্ল রাখিতে হইবে। সহজে যাহাতে উত্তেজিত না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দেশ হইতে এই রোগ দূর করিতে হইলে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। সমবায় সমিতি বা জনকল্যাণ মূলক সমিতি গঠন করিয়া গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সস্তায় খাঁটি দুধ ও ভিটামিন যুক্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত। রোগীর বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। আজকাল বি, সি, জি, বলিয়া যক্ষার যে টীকা বাহির হয়াছে উহাই শিশুদের পক্ষে খুব উপকারী। শিশুকালে এই টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যতে সুফল পাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং বর্তমানে যক্ষা-রোগে শিশুমৃত্যুর হারও কমিয়া যায়। এই টীকার ব্যাপক প্রসার হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কয়েকটি আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা

কাপড়ে আগুন লাগা

কাপড়ে আগুন লাগিলে তাহা নিভাইবার জন্য মোটেই জল ঢালা উচিত নহে, কারণ পোড়া জায়গায় জল লাগিলে বড় বড় ফোস্কা পড়িবে। এই ক্ষেত্রে প্রথমেই লোকটিকে শোয়ান এবং কাপড়ের জ্বলন্ত অংশ উপর দিক করিয়া রাখা কর্তব্য। দাঁড়াইয়া থাকিলে বা ভয়ে ছুটাছুটি করিলে বাতাস লাগিয়া আগুন বেশি করিয়া জ্বলিবে। জ্বলন্ত কাপড় নীচে রাখিয়া শুইলে আগুনের শিখা উপর দিকে উঠিয়া সমস্ত কাপড়ে ধরিবে।

লোকটিকে শোওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে কম্বল, লেপ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই দিয়া ভাল করিয়া চাপা দিতে হইবে। ইহাতে বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হইবার ফলে আগুন নিভিয়া যাইবে। এবং একই কারণে কম্বল, লেপ প্রভৃতিতে আগুন লাগিবে না।
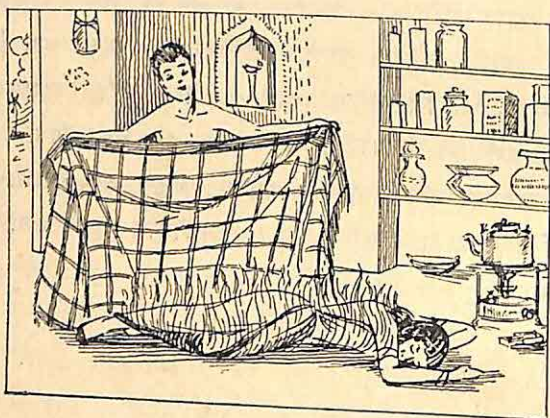
কাপড়ে আগুন লাগিলে এইভাবে নিভাইতে হইবে

আগুন নিভিবার পর আস্তে আস্তে গা হইতে কাপড় খুলিয়া লইতে হইবে। গায়ের সঙ্গে যেখানে যেখানে আঁটিয়া যাইবে সেখানে সেখানে পোড়া চামড়া উঠিয়া ঘা হইবার আশঙ্কা থাকায় টানাটানি করা উচিত নহে। সেই জায়গাগুলির চারিধারের কাপড় কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিলেই চলিবে—পরের ব্যবস্থা ডাক্তার আসিয়া করিবে। ফোস্কা পড়িলে নজর রাখিতে হইবে যাহাতে সেইগুলি গলিয়া না যায়। যদি দেহ খুব বেশি পুড়িয়া যায় এবং ডাক্তার আসিতে দেরী হয় তাহা হইলে সমপরিমাণে চুণের জল ও নারিকেল তৈল ফেটাইয়া আস্তে আস্তে লাগাইতে হইবে। বারনল, ট্যানিক্যাসিড্ মলম প্রভৃতি থাকিলে তাহাই লাগান উচিত। এইগুলিতে বিপদের আশঙ্কা কম।

পোড়া জায়গাটিতে যাহাতে বাতাস না লাগে সেইভাবে আলগা করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। পিঠ পুড়িয়া গেলে বিছানার সঙ্গে পোড়া জায়গা আটকাইয়া যায়, সেইজন্ত পরিষ্কার করিয়া ধোওয়া কলাপাতা বিছাইয়া শোয়ান উচিত।

জলে ডোবা

কোন জলে ডোবা লোককে তোলা হইলে প্রথমেই তাহার কাপড়-চোপড় আল্‌গা করিয়া মুক্ত বায়ুতে শোয়াইয়া ডাক্তার ডাকিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ ও নাক হইতে জল, কাদা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে না বলিয়াই রোগীকে মৃত মনে করা ভুল। দশ পনের মিনিট পর্যন্ত শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় থাকিলেও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা জলে ডোবা লোককে বাঁচান যায়। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য সম্পাদন করার আগে ডুবিবার ফলে যে জল পেটে ঢুকিয়াছে তাহা বাহির করা প্রয়োজন। উহা করিতে হইলে লোকটিকে প্রথমে চিৎ করিয়া শোয়াইতে হইবে। তাহার মাথাটি নীচু অবস্থায় রাখিবার জন্ত বুকের তলায় একটি বালিশও দেওয়া প্রয়োজন। তাহার পর লোকটির জিভ টানিয়া মুখের এক পাশে বাহির করিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি ধরিয়া বারকয়েক উঁচু দিকে তুলিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নামাইতে হইবে। হাত দুইটি তুলিবার সময় বুকের দুই পাশ ধরিয় াবারকয়েক ঝাঁকুনি দিলে মুখ দিয়া পেটের জল বাহির হইতে থাকিবে। সব সময় কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন জিভটি ভিতরে ঢুকিয়া না যায়।

পেট হইতে জল আর এক উপায়ে বাহির করা যায়। এই প্রণালীতে লোকটির বুকের নীচে বালিশ দিয়া তাহাকে উপুড় করিয়া শোয়াইতে হইবে। তাহার কপাল যেন দক্ষিণ হস্তের নিম্ন বাহুর উপর থাকে।

এইবার নিজের দুই করতল দিয়া লোকটির তলার পাঁজরার উপর তিন কি চার সেকেণ্ড ধরিয়া চাপ দেওয়া প্রয়োজন। তাহার পর লোকটিকে দক্ষিণ দিকে ফিরাইয়া আবার তিন চার সেকেণ্ড রাখিতে হইবে। যতক্ষণ লোকটি নাক মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইবে ততক্ষণ পর্যায়ক্রমে প্রক্রিয়াটি চালাইতে হইবে। জল এই উপায়ে বাহির করিলে অনেক সময় আপনা আপনি শ্বাসকার্য চলিতে আরম্ভ হয়। না হইলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাইতে হইবে।
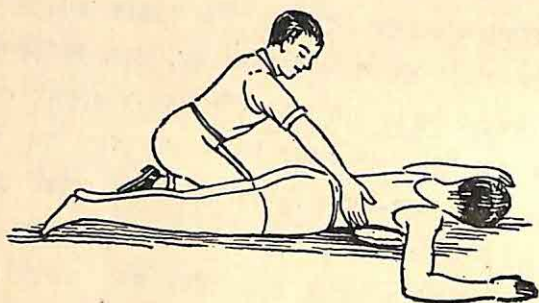
জলে ডোবা
পেট হইতে জল বাহির করা হইতেছে

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য করাইবার জন্য লোকটিকে চিৎ করিয়া তাহার কাঁধের নীচে বালিশ দিয়া মাথাটি নীচু অবস্থায় রাখিতে হইবে। জিভ যাহাতে মুখের একদিকে ঝুলিতে থাকে তাহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাহার পর লোকটির হাত দুইটি কনুইর নিকট ধরিয়া প্রথমে বুকের দুই পাশে আনিয়া পরে যতদূর সম্ভব মাথার দিকে টানিয়া লইতে হইবে এবং পুনরায় বুকের দুইপাশে আনিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াটি মিনিটে অন্ততঃ পনের বার যাহাতে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যতক্ষণ ডাক্তার না আসে বা স্বাভাবিক শ্বাসকার্য চলিতে না থাকে ততক্ষণ প্রক্রিয়াটি চালাইতে হইবে।

এই প্রণালী ব্যতীত আর এক উপায়েও জলে ডোবার চিকিৎসা করা যায়। জলে ডোবা লোকটিকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া তাহার কাঁধের তলায় একটি পাতলা বালিশ দিয়া মাথাটি সামান্য নীচু ও এক পার্শ্বে কাত করিয়া রাখিতে হইবে। জিভটিকেও টানিয়া বাহির করিতে হইবে। তাহার পর হাত দুইটিকে মাথার দিকে টানিয়া রাখিলে মুখ দিয়া জল বাহির হইতে থাকিবে। এইবার শুশ্রূষাকারীকে লোকটির এক পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাত তাহার দুই দিকের শেষ পাঁজরার উপর এমন
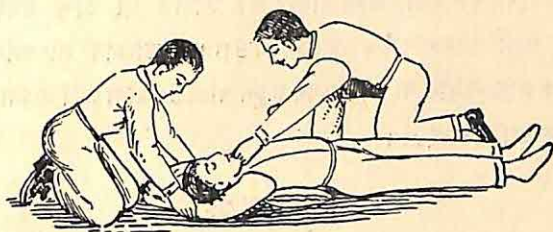
জলে ডোবা

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য করান হইতেছে

ভাবে রাখিতে হইবে যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি প্রায় পরস্পরকে ছুঁইয়া থাকে। তাহার পর শুশ্রূষাকারীকে দুই হাত সোজা রাখিয়া সামনের দিকে এমনভাবে ঝুঁকিতে হইবে যাহাতে শরীরের সমস্ত ভার দুই হাতের কব্‌জীর উপর পড়ে। এইরূপ করিলে লোকটির বুকের তলার দিকে জোর চাপ পড়িবে। এক-দুই-তিন গুণিতে যে সময় লাগে সেই সময়-টুকু চাপ দিয়া হাত শেষ পাঁজরা হইতে না তুলিয়া শুশ্রূষাকারীকে পুনরায় আগকার অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় লোকটির বুক হইতে চাপ সরিয়া যাইবে। সামনে ঝুঁকিয়া চাপ দেওয়া ও পুনরায় আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসার পদ্ধতি একটানা চালাইতে হইবে।

মাঝে মাঝে বাদ দিলে চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে চাপটি বস্তিদেশে না পড়িয়া কেবলমাত্র শেষ পাঁজরায় পড়ে।

ক্রমাগত কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালাইবার ফলে খুব গুরুতর অবস্থা না হইলে জলে ডোবা রোগীর স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস শীঘ্রই চলিতে আরম্ভ করিবে। এই সময় তাহার উপর কড়ানজর রাখা উচিত। তাহাকে দাঁড়াইতে বসিতে বা এমন কিছু করিতে দিতে নাই যাহাতে দুর্বলতা হেতু তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইতে পারে। তাহাকে একটু গরম দুধ খাওয়ান, এবং শরীর গরম রাখার জন্য তাহার গা হাত রগড়ান বা শরীরে গরম জলের সেঁক দেওয়া কর্তব্য। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত তাহাকে নড়ান-চড়ান বা ডাক্তারের হুকুম ব্যতীত তাহার বিছানা হইতে ওঠা বন্ধ রাখিতে হইবে।

পড়িয়া যাওয়া

লোকে নানা ভাবে ও নানা স্থান হইতে পড়িতে পারে। পতনের অবস্থার গুরুত্বের উপর আঘাতের গুরুত্ব নির্ভর করে। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ কলা বা ফলের খোসায় পা পিছলাইয়া হাত, পা, কোমর এমন কি মাথা অবধি ভাঙ্গিতে পারে। তবে সচরাচর হাত ও পা ভাঙ্গিয়া থাকে। চলন্ত ট্রাম হইতে পড়িয়াও দেহের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগিতে পারে—সময় সময় চাকার তলায় পড়িয়া প্রাণও হারাইতে হয়। চলন্ত ট্রেণ হইতে পড়িয়া সাধারণতঃ লোকে চাকার তলায় প্রাণ হারায়। বাড়ীর ছাদ বা বারান্দা হইতে পড়িলে মাথা, মেরুদণ্ড ও কোমর ভাঙ্গিবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

পতনের ফলে কখন কোথায় আঘাত লাগিবে এবং তাহার গুরুত্ব কিরূপ হইবে তাহা বলা যায় না। হয়তো এমন আঘাত লাগিল যে তাহার চিকিৎসা সম্ভব নহে। মাথা চৌচির হইয়া ফাটিয়া ঘিলু বাহির হইলে,

অথবা ঘাড় ভাঙ্গিবার ফলে সুষুম্নাকাণ্ডে আঘাত লাগিলে বাঁচাইবার আর কোন উপায় থাকে না। অথচ একটু সাবধান হইয়া পথ চলিলে, বাহাদুরী দেখাইবার জন্য চলন্ত ট্রামে বা ট্রেনে লাফ দিয়া না উঠিলে এবং গোঁয়ার্তুমি করিয়া উঁচু জায়গা হইতে না ঝুঁকিলে, বা ঘুড়ি ধরিবার জন্য পাঁচিলে ওঠার বদ-অভ্যাস ত্যাগ করিলে অনেক বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

হঠাৎ কেহ পড়িয়া গেলে প্রথমে দেখিতে হইবে তাহার জ্ঞান আছে কি না। জ্ঞান না থাকিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে লোকটির চারিধারে যাহাতে ভীড় না হয়। ভীড় হইলে বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত ঘটার ফলে লোকটির শ্বাসকষ্ট হইতে পারে। তাহার গায়ে বা কোন জায়গা কাটিয়া গেলে সেখানে যাহাতে ময়লা না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাটা জায়গা ধুইয়া টিংচার আইওডিন লাগাইতে হইবে।

লোকটির যদি জ্ঞান থাকে অথচ আঘাত সাংঘাতিক হয় তাহা হইলে তাহাকে সাবধানে তুলিয়া হাসপাতালে, ডাক্তারখানায় অথবা বাড়ীতে আনিতে হইবে। স্ট্রেচার বা রোগী বহন করিবার খাটে করিয়া বহন করা উচিত। অভাবে, সাধারণ দড়ির খাটিয়া করিয়া সাবধানে বহন করিতে হইবে। তাহাতে নাড়ানাড়ির ফলে আঘাত বাড়িবার সম্ভাবনা কম থাকে। ডাক্তার আসিবার আগে আঘাতের স্থানে বরফ অথবা জলে কাপড় ভিজাইয়া জলপট্টি লাগান উচিত। যদি আঘাত কম হয় এবং হাড় না ভাঙ্গে তাহা হইলে জলপট্টি বা বরফেই কাজ দেয়; কিন্তু হাড় ভাঙ্গিলে ডাক্তারের প্রয়োজন। অনেক সময় আঘাত গুরুতর না হইলেও মাংস-পেশীতে মোচড় লাগে, অথবা কণ্ডরা বা অস্থিবন্ধনী ছিঁড়িয়া যায়। যদি ডাক্তার না পাওয়া যায় তাহা হইলে খুব সাবধানে চলা উচিত। কাছাকাছি যদি প্রাথমিক প্রতিবিধান জানা কেহ থাকেন তিনিও উপস্থিত সাহায্য করিতে পারেন। প্রাথমিক প্রতিবিধান হিসাবে ভাঙ্গা জায়গার

তলায় একটুক্‌রা পরিষ্কার চেপ্‌টা ও লম্বা কাঠ দিয়া ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটি নিরাপদে থাকে। ক্ষতস্থান দিয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে সেখানে টর্ণিকেট বাঁধার প্রয়োজন। টর্ণিকেট বাঁধিবার ব্যবস্থা পরে বর্ণনা করা হইয়াছে। আঘাত গুরুতর হইলে বা হাড় ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইলে অনেক সময় মর্ফিয়া ইন্‌জেকসন দ্বারা লোকটিকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় এবং অজ্ঞান অবস্থায় ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেওয়া বা প্রয়োজন মত অস্ত্রোপচার করা হয়।

কাঁকড়া বিছা কামড়ান

কাঁকড়া বিছা বা বিচ্ছু সাধারণতঃ কামড়ায় না, হুল বিঁধাইয়া দেয়। তাহাদের লেজের আগায় হুলের মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্ম নালী আছে। সেই নালী আবার বিষ থলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। হুল ফুটানর সময় সেই বিষ আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। বিষ ভালভাবে ছোট ছোট শিশু-দের দেহে প্রবেশ করিলে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাহাদের মৃত্যু ঘটিতে পারে। কাঁকড়া বিছার বিষ দেহে প্রবেশ করিলে হুল ফুটানর স্থানে এবং তাহার চারিপাশে তীব্র বেদনা হয়। সেই স্থানটি ফুলিয়া ওঠে এবং শরীরে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। সময় সময় ক্ষত গুরুতররূপে পাকিয়া যায়।

কাঁকড়া বিছা কামড়াইলে ক্ষতস্থানে প্রথমে একটি চাবির ফুটা দিয়া চাপিতে হইবে। এই রকম করিলে হুলটি চাপের ফলে বাহির হইয়া আসিবে, এবং বিষও ছড়াইয়া পড়িতে পারিবে না। হুলটি বাহির হইলে ক্ষতস্থানটি অ্যামোনিয়া অথবা নিশাদল ও চূণ একত্রে মিশাইয়া বার বার ধুইতে হইবে। ওডিকোলন অথবা শোধিত স্পিরিট দিয়া ধোওয়া যাইতে পারে। ভাল করিয়া ধুইবার পর বাইকার্বনেট অব সোডা ও স্যালভোলাটাইল একত্রে কাইয়ের মত করিয়া মিশাইয়া লাগান উচিৎ।

তাহাতে যন্ত্রণার লাঘব হয়। কাহার কাহার মতে একফোঁটা মধু ও একফোঁটা ফিনাইল একত্রে মিশাইয়া লাগাইলেও খুব উপকার দেয়। মিহিজামের পি, ব্যানার্জীর লেক্সিন নামক ঔষধটি কাঁকড়া বিছার দংশনের মহৌষধ। ক্ষতস্থানে ভাল করিয়া লেক্সিন লাগাইয়া আরও খানিকটা তুলা বা ন্যাকড়ায় লইয়া ভাল ভাবে শুঁকিলে অতি শীঘ্রই ফল পাওয়া যায়।

বোলতার কামড়

কাঁকড়া বিছার মত বোলতাও দংশন করে, কামড়ায় না। বোলতার হুল কাঁকড়া বিছার হুলের মত বাহির করিয়া দিতে হয়। হুল থাকিয়া গেলে স্থানটি পাকিতে ও পচিতে পারে। বোলতার কামড়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। একটি দুইটি কামড়ে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু বোলতার ঝাঁক কামড়াইলে মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। বোলতার কামড়ের জায়গায় ভালভাবে অ্যামোনিয়া, সোডা গোলা জল, কচুগাছের ডাঁটার রস, ডেটল প্রভৃতি লাগাইলে উপকার হয়।

কুকুরে কামড়ান

কুকুর কামড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান ভাল ভাবে ধুইয়া টিংচার-আইওডিন লাগান উচিত। ক্ষত স্থানের কিছু উপরে সাপে কামড়াইলে যেরূপ তাগা বাঁধা হয় সেইরূপ তাগা বাঁধিয়া ক্ষতস্থানটি কার্বলিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা পুড়াইয়া দেওয়া উচিৎ।

বাড়ীর পোষা কুকুর যদি কামড়ায় তাহা হইলে তাহাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া পাগল কিনা পরীক্ষা করা দরকার। কুকুর যদি জলস্পর্শ না করে এবং চুপ করিয়া অন্ধকার কোণায় যাইয়া বসে, কিংবা কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহার করিতে থাকে ও সকলকে কামড়াইতে আসে তাহা

হইলে বুঝিতে হইবে অবস্থা সন্দেহজনক। এই অবস্থায় কুকুরটিকে বাঁধিয়া রাখিলে দেখা যাইবে কয়েক ঘণ্টার ভিতর তাহার মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছে এবং তাহার চোয়াল পক্ষাঘাতের দরুণ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সে খাওয়া দাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। দুইতিন দিন নিশ্চলভাবে ঝিমাইবার এবং মাঝে মাঝে করুণ ভাবে চিৎকার করার পর সে মরিয়া যাইবে। কুকুরটি যদি দশদিনের ভিতর মারা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উহা নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার ইনজেকসন নেওয়া কর্তব্য।

সাধারণতঃ কুকুরের কামড় মারাত্মক নহে, কিন্তু সেই কুকুরটি যদি পাগল হয় তাহা হইলে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ পাগলা কুকুরের লালায় জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু থাকে এবং ঠিকমত চিকিৎসা না হইলে জলাতঙ্ক রোগের পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। এই রোগ কুকুর কামড়াইবার পনের দিন হইতে সাত আট মাসের মধ্যে দেখা দেয়। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা আরম্ভ হয় ততই ভাল। এই চিকিৎসা সব জায়গায় নাই এবং সব ডাক্তারও ইহার চিকিৎসা করিতে পারে না। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর প্রবর্তিত চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা কার্যকরী নহে। পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিষেধক বাহির করেন। তাঁহার মতে যাহাকে কুকুর কামড়াইয়াছে তাহার দেহে যদি জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ঔষধ কয়েক দফায় প্রবেশ করান হয় তাহা হইলে সে আরোগ্য লাভ করিবে।

এখন পাস্তুর-পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত ঔষধ রোগীর পেটে ইনজেকশন করিয়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশে রোগ সারান হইতেছে। বাংলা দেশে কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাস্তুর ইনস্টিট্যুট বলিয়া পাগলা কুকুর কামড়ানর বিশেষ চিকিৎসাগার

আছে। পাগলা কুকুর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে সেখানে পাঠান উচিৎ। পাগলা কুকুর বাদে সাধারণ কুকুর কামড়াইলে ক্ষতস্থান ভাল-ভাবে ধুইয়া টিনচার আইওডিন লাগাইলে ক্ষত পাকিয়া বিষাক্ত হইবে না। রাস্তার-কুকুর পাগল কিনা সব সময় জানা যায় না। সুতরাং অচেনা রাস্তায় কুকুর হঠাৎ কামড়াইলে কুকুরে কামড়ানর চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

সর্পাঘাত

সাপে কামড়াইলে ভয়ে দিশাহারা হইলে চলিবে না। প্রথমেই কামড়ান জায়গার কিছু উপরে শক্ত দড়ি বা কাপড়ের টুক্‌রা দিয়া জোরে এমন ভাবে বাঁধন দিতে হইবে যাহাতে কোন প্রকারে বিষ শরীরে ছড়াইয়া যাইতে না পারে। তাহার পর দেখিতে হইবে সাপটি বিষধর কি নির্বিষ। সাপ যে জায়গায় ছোবল মারিয়াছে সেখানে যদি দেখা যায় দুইটি বড় বড় দাঁতের দাগ কাছাকাছি, পাশাপাশি ও আড়াআড়ি ভাবে আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সাপটি নির্ঘাৎ বিষধর। কিন্তু যদি সব দাঁতের দাগগুলি একই মাপের হয় তাহা হইলে সাপটি সাধারণ নির্বিষ পর্যায়ের।

বিষধর সাপের বিষদাঁত দুইটি ইন্‌জেক্‌সন দিবার ছুঁচের মত ফাঁপা। প্রতি পার্শ্বের চোখের তলায় ও উপর চোয়ালের বাহির দিকের একটি বিষথলি হইতে বিষনালী আসিয়া সেই দিকের দাঁতের ভিতর ঢুকিয়াছে। সাপের ছোবলের সময় বিষগুলি সঙ্কুচিত হয়, এবং তাহার ফলে উহা হইতে বিষ বাহির হইয়া বিষনালী ও বিষদাঁতের ভিতর দিয়া ক্ষত স্থানে প্রবেশ করে, এবং আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশে। বিষধর সাপের কামড়ের জায়গা খুব ফুলিয়া ওঠে ও চারিপার্শ্বের রক্ত নীল হইয়া জমাট বাঁধে। সেই জায়গাটি তীক্ষ্ণ শলাকা বা ছুরি দিয়া চিরিলে ঘন ও কালো রক্ত

বাহির হয়। কামড়ের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে; তাহার মুখ দিয়া লালা ও ফেনা বাহির হয় এবং সে অজ্ঞান হইয়া যায়। ঠিকমত চিকিৎসা না হইলে তাহার জীবনের আশা থাকে না। স্বাস্থ্য খারাপ বা হৃৎপিণ্ড দুর্বল থাকিলে দশ মিনিটের মধ্যে মারা যাইবার সম্ভাবনা থাকে। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে এবং বিষ বেশি মাত্রায় না ঢুকিলে আক্রান্ত ব্যক্তি ছয় হইতে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে।
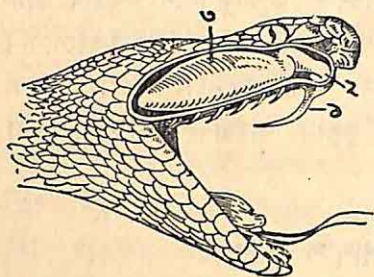
বিষধর সাপের মাথা
১—বিষদাঁত ; ২—বিষনালী ; ৩—বিষথলি

সাপে কামড়ান লোককে চুপ করিয়া শোয়াইতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব কামড়ের চারি আঙ্গুল উপরে খুব আঁট করিয়া দড়ি বা কাপড় ছিঁড়িয়া তাহার টুক্‌রা দিয়া এমনভাবে শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে যাহাতে ঐ স্থানের রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে। প্রয়োজন হইলে প্রথমে বাঁধনের উপরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাঁধন দিতে হইবে। এইরূপ বাঁধনকে তাগা বাঁধা বলে। ইহা ঠিকমত হইলে দেহে বিষ ছড়াইয়া পড়িতে পারে না। তাগা বাঁধার পর কামড়ের জায়গা খুব ধারাল ছুরি বা কোন তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়া ফালাফালা করিয়া চিরিতে হইবে। কিন্তু নজর রাখিতে হইবে যাহাতে শিরা বা ধমনী কাটিয়া না যায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলেই মারা যাইবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। চিরিবার পর ক্রমাগত চাপ দিয়া বিষাক্ত কাল রক্ত বাহির করার পর যখন লাল রক্ত বাহির হইবে তখন বুঝিতে হইবে যে বিষ আর দেহে নাই। এইবার ছুরি দিয়া কাটা জায়গায় ভাল করিয়া পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট গুঁড়া লাগাইতে হইবে।

ইতিমধ্যে ডাক্তারকে খবর পাঠাইতে হইবে, এবং ডাক্তারের মত ছাড়া তাগা-বাঁধা খোলা উচিৎ নহে। মনে রাখিতে হইবে বিজ্ঞানের যুগে ওঝার আশ্রয় অপেক্ষা ডাক্তারের সাহায্য বেশি নির্ভর-যোগ্য ও প্রয়োজনীয়।
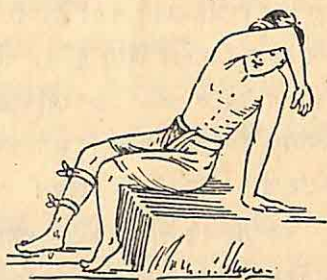
তাগা বাঁধিবার নিয়ম

সাপের কামড়ের ভাল ঔষধ নাই। তবে সাপের বিষ হইতে প্রস্তুত অ্যান্টিভেনিন নামক ঔষধ ঠিক সময়ে ইন্‌জেকসন করিতে পারিলে উপকার পাওয়া যায়। যে জাতীয় সাপ কামড়াইয়াছে সেই জাতীয় সাপের অ্যান্টিভেনিন ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল। অন্যথায় মিশ্রিত অ্যান্টিভেনিন ব্যবহার করা উচিৎ।

সাপে কাটা রোগীকে চলাফেরা করান বা উত্তেজিত করা, অথবা ভয় দেখান উচিৎ নহে। সব সময় তাহাকে সাহস দিতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে হৃৎস্পন্দন বা শ্বাসকার্য বন্ধ না হয়। পাড়ার ডিসপেন্সারিতে অথবা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ও সাপের কামড়ের প্রতিষেধক অ্যান্টিভেনিন নামক ইঞ্জেকসন দিবার ব্যবস্থা সব সময়ে রাখা উচিৎ। লেক্সিন নামক ঔষধটিও রাখা ভাল। সময়ে সময়ে এই ঔষধ বেশ উপকার দেয়।

কাটিয়া যাওয়া

দেহের বিভিন্ন অংশ নানা উপায়ে কাটিয়া যাইতে পারে। কাটার ফলে ধমনী, শিরা বা কৈশিকনালী ছিন্ন হইলে ক্ষতমুখ দিয়া রক্তস্রাব হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাটিয়া যাইলে সর্বপ্রথমে ক্ষতস্থান হইতে

রক্তস্রাব বন্ধ করা প্রয়োজন। ধমনী কাটিয়া ধামনিক রক্তস্রাবের সময় রক্ত গাঢ় লাল রংয়ের দেখিতে হয় এবং পিচকারীর ধারার মত বেগে হৃৎপিণ্ডের দিক হইতে বিপরীত দিকে ছুটিয়া বাহির হয়। শিরা কাটিয়া শৈরিক রক্তস্রাব হইলে সেই রক্ত দেখিতে কালচে লাল রংয়ের হয়। উহা একটানা রক্তস্রোতের মত হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিক হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে ধীরে ধীরে বহিতে থাকে।

রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে উহা ধামনিক রক্ত না শৈরিক রক্ত। ধামনিক রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে প্রথমে যেস্থানে কাটিয়াছে সেইস্থানের কিছু উপরে হৃৎপিণ্ডের দিকে আঙ্গুলের চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আঙ্গুলের চাপে রক্ত বন্ধ না হইলে পরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রার ভিতরে পাতলা সমান কাঠের টুক্‌রা দিয়া পরে ভাঁজ করিয়া শক্ত প্যাড বা গদি তৈয়ারী করিতে হইবে। সেই প্যাডটি ক্ষতস্থানের উপর রাখিয়া জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ করিলেই রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। রক্ত বন্ধ না হইলে ক্ষতস্থানের একটু উপরে প্রধান ধমনীটিকে একটি প্যাড চাপা দিয়া সেই প্যাডটিকে দড়ি, বিছানা বাঁধিবার স্ট্র্যাপ, রুমাল বা ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিতে হইবে। প্যাডের বিপরীত দিকে বন্ধনীটির বাঁধন দিতে হইবে এবং সেই বন্ধনটির ফাঁকের ভিতর একটি শক্ত বা সরু ছড়ি, কাঠের লম্বা টুক্‌রা বা ছাতার হাতলের অংশ ঢুকাইয়া উহার দ্বারা ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটিকে পাক দিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যাণ্ডেজটি ক্রমশঃ আঁট হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্যাডটিও ধমনীর উপর চাপিয়া বসিবে এবং ধমনীর উপর চাপ পড়ায় রক্তও বন্ধ হইবে। এইরূপ ব্যবস্থাকে টর্ণিকেট প্রয়োগ করা বলে।

শৈরিক রক্তস্রাব হইলেও প্রায় এই একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আঙ্গুল দিয়া চাপা বা প্যাড দিয়া চাপা এবং টর্ণিকেট প্রয়োগ

করার দ্বারা শৈরিক রক্তস্রাব বন্ধ করা যায়। কেবল মাত্র তফাৎ এই যে শৈরিক রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে আঙ্গুলের চাপ বা টর্ণিকেট প্রয়োগ প্রভৃতি ক্ষতস্থান হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে না করিয়া তাহার বিপরীত দিকে করিতে হইবে। কারণ শৈরিক রক্তস্রোত ধামনিক রক্তস্রোতের মত হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের বিভিন্ন অংশের দিকে বহেনা, বরং দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে বহে।

রক্ত বন্ধ হইলে ক্ষত যাহাতে দূষিত না হয় সেইজন্য সেইস্থানে টিংচার আইওডিন, আইডোফরম, করোসিভ সাব্লিমেণ্ট, ডেটল, মারকিউরোক্রোম প্রভৃতি বীজাণুনাশক ঔষধ লাগান উচিৎ। ইহার পর নিয়মিতভাবে ক্ষত না শুকান পর্যন্ত ফুটন্ত জলে পরিষ্কার তুলা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানটি ধোওয়া প্রয়োজন। জলে কয়েক ফোঁটা ডেটল মিশাইয়া লইলে খুবই ভাল হয়। ক্ষতস্থানটি বেশ বড় রকমের হইলে ঔষধ লাগানর পর ভালভাবে ব্যাণ্ডেজ করা উচিৎ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্যায়াম

শরীরের মাংসপেশীকে নিয়মিত ভাবে চালনা করার নাম ব্যায়াম। দেহকে সতেজ ও পুষ্ট করিবার জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বলিতে দৈহিক ও মানসিক এই দুইপ্রকার স্বাস্থ্য বোঝায়। ব্যায়াম করিলে দেহ সুস্থ হয় আবার মনও প্রফুল্ল হয়।

বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম আছে। উপযুক্ত ব্যায়ামে দেহের সমস্ত পেশীই কাজ করে ও পরিপুষ্ট হয়। শরীরে রক্ত চলাচলও ভালভাবে হয়। ব্যায়ামের ফলে নার্ভের কাজ ঠিকমত চলে ও ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের

জন্য বেশি পরিমাণে অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে। অক্সিজেন আমাদের শরীরের পক্ষে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। অক্সিজেনের সাহায্যে রক্ত বিশুদ্ধ হয় ও শরীরের দহন কার্য ভালভাবে হয়। ব্যায়ামে ঘাম হয় ও তাহাতে শরীর হইতে দূষিত পদার্থ ও ক্লেদ বেশি পরিমাণে বাহির হইতে থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম হিসাবে দৌড়াদৌড়ি, ডন বৈঠক দেওয়া, ডাম্বেল ভাঁজা, মুগুর ভাঁজা, সাঁতার কাটা, খেলাধূলা, জোরে জোরে হাঁটা, সাইকেল চড়া, সংঘবদ্ধ হইয়া ড্রিল, প্যারেড্, বা কুচকাওয়াজ প্রভৃতি নিয়মিত করা যাইতে পারে।

সাত-আট বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ব্যায়ামের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু তাহার পরে মেয়েদের ব্যায়াম পৃথক হওয়া উচিৎ। মেয়েদের ব্যায়াম হিসাবে দড়ি-লাফান, ছুটাছুটি, নাচ, জল তোলা, ঝাঁট দেওয়া, সাঁতার কাটা, বাটনা বাটা, ইত্যাদি নিয়মিত করা যাইতে পারে। অল্প বয়সে যে সকল ব্যায়াম করা চলে বেশি বয়সে সে সকল ব্যায়াম করা চলে না। পরিণত বয়সে বেশ খানিকটা হাঁটিলেই ব্যায়াম করা হয়।

যখন তখন ব্যায়াম বা অতিমাত্রায় ব্যায়াম করিলে তাহার ফল ভাল হয় না। ব্যায়াম করিবার নির্দিষ্ট সময় ও নিয়ম থাকা উচিৎ। ভোরে উঠিয়া মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করা সর্বাপেক্ষা ভাল। কারণ রাত্রিতে পূর্ণ বিশ্রামের পর পেশীগুলি সবল ও সতেজ থাকে। কিন্তু সারাদিন কাজকর্মের পর ব্যায়াম করিতে গেলে সুফল অপেক্ষা কুফলই লাভ হয়। বদ্ধ ঘরে ব্যায়াম করিয়া লাভ নাই। ব্যায়ামের সহিত মুক্ত বায়ু সেবনের প্রয়োজন। খালি পেটে বা পেট ভরিয়া খাইয়া ব্যায়াম করা উচিৎ নয়। সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিবার পর ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যসম্মত। ব্যায়াম শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ বাদে পরিমিত ও সুসম আহারেরও প্রয়োজন। ভাল ও পরিমিত

এবং সুসম আহার না করিয়া কেবল ব্যায়াম করিলে শরীর সবল হওয়া অপেক্ষা দুর্বলই হইয়া পড়িবে, এবং শরীরের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। কারণ ব্যায়াম করিলে শরীরে যে দহন কার্য হয় তাহার ফলে দেহের ক্ষয় সাধন হইয়া থাকে এবং একমাত্র খাদ্যই সেই ক্ষয় পূরণ করিতে পারে। সুতরাং উপযুক্ত ব্যায়ামের পর উপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন।

অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। কারণ তাহাতে পেশীগুলি দুর্বল হইয়া যায় ও তাহার ফলে দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে। অতএব ব্যায়ামের পর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা উচিৎ। মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় বিশ্রাম হইল ঘুম। সেইজন্য ঘুমের পর শরীর ও মনের সকল জড়তা ও ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। ব্যায়ামকারীর যাহাতে বেশ ভাল করিয়া ঘুম হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার একান্ত প্রয়োজন। অপরিচ্ছন্নতা যে শুধু দেহকে অসুস্থ করে তাহা নয়, মনেরও প্রফুল্লতা নষ্ট করে।

আমাদের দেহে যে ত্বক্ বা চামড়ার আবরণ আছে তাহা সব সময়ে পরিষ্কার রাখা উচিৎ। ত্বক্ বা চামড়ার উপর যে অসংখ্য লোমকূপ আছে সেগুলির ভিতর দিয়া ঘাম নির্গত হয়। ঘামের সহিত শরীরের ভিতরের দূষিত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়, কিন্তু লোমকূপের মুখ যদি বন্ধ থাকে তাহা হইলে ঘাম ও শরীরের ক্লেদ বাহির হইতে পারে না।

ইহা ছাড়া চামড়া অপরিষ্কার রাখিলে খোস, পাঁচড়া, দাদ, চুলকানি প্রভৃতি চর্মরোগ হয়। এই চর্মরোগ যাহার হয় লোকে তাহাকে কাছে আসিতে দেয় না এবং ঘৃণা করে। ইহাও কম লজ্জার কথা নয়। অতএব ত্বক্ বা চামড়া পরিষ্কার রাখিতে হইলে নিয়মিতভাবে গা রগড়াইয়া স্নান করা উচিৎ। সপ্তাহে দুই তিন দিন সাবান বা বেসম দিয়া গা পরিষ্কার করিতে পারিলে ভাল হয়।

কেবলমাত্র দেহ পরিষ্কার রাখিলেই চলিবে না ; সঙ্গে সঙ্গে নখ, দাঁত, মুখ, চুল, কাপড়-চোপড় ইত্যাদিও পরিষ্কার রাখা উচিৎ।

হাত দিয়া আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। খাইবার সময়ে হাতের নখ হইতে অনেক ময়লাও আমাদের পেটে যাইতে পারে। সুতরাং হাতের নখ ছোট করিয়া কাটিয়া সর্বদা পরিষ্কার রাখা উচিৎ। ইহা ছাড়া গা চুলকাইলে অথবা আঁচড়াইলে নখের ভিতরে সঞ্চিত বিষাক্ত ময়লা আমাদের দেহের রক্তের সহিত মিশিয়া তাহা দূষিত করিতে পারে।

দাঁত আমাদের দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। দাঁত অকালে নষ্ট হইলে অনেক দুর্ভোগ সহিতে হয়। সেইজন্য দাঁতের বিশেষ যত্ন লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য। প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া ভাল করিয়া দাঁত মাজা উচিৎ। দাঁত মাজার নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। অনেকে নিমের দাঁতন ব্যবহার করে অথবা খড়ি কিম্বা ছাই লইয়া আঙ্গুল দিয়া দাঁত মাজে, আবার অনেকে গুঁড়া মাজন অথবা টুথপেষ্ট ব্যবহার করে। আজকাল বেশির ভাগ লোকে দাঁতমাজা বুরুশ বা টুথব্রাশ দিয়া দাঁত মাজেন। প্রতিবার দাঁত মাজার পর বুরুশ খুব ভাল করিয়া গরম জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিৎ। কারণ উহার ফাঁকে ফাঁকে যে ময়লাগুলি জমে তাহা দাঁতের পক্ষে অহিতকর। সকালে ও রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে দাঁত মাজার অভ্যাস করা খুব ভাল। দাঁত না পরিষ্কার করিলে আমাদের

আহার্য বস্তুর কণাগুলি দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লাগিয়া থাকে ও পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়। উহারা একপ্রকার টক রসের সৃষ্টি করিয়া দাঁতকে নষ্ট করে। দাঁতের অযত্ন করিলে পাইওরিয়া হইতে পারে। পাইওরিয়া একপ্রকার দন্তরোগ—ইহা হইলে দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত ও পূঁজ পড়ে ও মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। পাইওরিয়া হইতে নানাপ্রকার পেটের রোগ হইতে পারে।

দাঁতের অভাবে খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া খাওয়া চলে না এবং ইহাতে হজমের ব্যাঘাত হয়। প্রতিদিন এইভাবে খাদ্যদ্রব্য হজম না হইতে হইতে অবশেষে অজীর্ণ রোগ দেখা দেয়।

চুল পরিষ্কার রাখা ও প্রতিদিন নিয়মিত আঁচড়ান উচিৎ। নিয়মিত চুল আঁচড়াইলে চুলের গোঁড়া শক্ত হয়, মাথায় খুস্‌কি বা মরামাস, উকুন প্রভৃতি হইতে পারে না। ইহা ছাড়া আঁচড়ান চুল দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। চুল না আঁচড়াইলে কুৎসিত দেখায়। মাথায় উকুন হইলে লোকে ঘৃণা করে। সব সময়ে বাতাসের সহিত যে ধূলাবালি উড়িতেছে সেইগুলি আমরা মাথায় যে তেল দিই তাহার সহিত মাথার চুলে আটকাইয়া যায়। চিরুণী দিয়া ভালভাবে আঁচড়াইলে ঐ ময়লা দূর হয় ও চামড়া পরিষ্কার থাকে। সুতরাং নিয়মিত চুলে তেল দিয়া পরে মাথা ধোওয়া উচিৎ। তেল না দিলে চুলের গোড়া শক্ত হয় না, চুলগুলি রুক্ষ দেখায় ও তাহাতে জটা পড়িয়া যায়। ইহাতে চুল নষ্ট হইয়া যায়।

প্রতিদিন প্রত্যূষে ভাল করিয়া চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়া চোখ ধুইতে হয়। চোখে পিচুটি অথবা ময়লা থাকিলে ঘা হইতে পারে।

প্রত্যহ কাপড়-জামা কাচা উচিৎ। জামা-কাপড় অপরিষ্কার থাকিলে নানারূপ চর্মরোগ দেখা দেয়। অপরিষ্কার জামা-কাপড়ে যে সব জীবাণু থাকে তাহারাই চর্মরোগের কারণ। সাদা জামা পরিলে সহজে ময়লা হয়

বলিয়া অনেকে রঙীন জামা-কাপড় পরেন। কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। রঙীন জামায় ময়লা ঠিকই লাগে, তবে তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারা যায় না। কাপড়-জামা না কাচিলে উহা হইতে ঘামের দুর্গন্ধ বাহির হয়।

প্রতিদিন বিছানাপত্র ভালভাবে ঝাড়া উচিৎ। বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় ময়লা দেখিলেই কাচা উচিৎ। পরিষ্কার বিছানায় শুইলে মন প্রফুল্ল থাকে ও ভাল ঘুম হয়। ময়লা বিছানায় নানাপ্রকার রোগের বীজাণু থাকিবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সুতরাং সকলেরই বিছানাপত্র পরিষ্কার রাখা উচিৎ।

প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস করা উচিৎ। ইহা করিলে দেহ সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে। মলমূত্রের বেগ কখনও ধারণ করা উচিৎ নয়, তাহাতে দেহযন্ত্রের অপকার হয়।

পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা

কেবলমাত্র দৈহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না—স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর রাখিতে হইবে।

আমরা যে বাড়ীতে থাকি সেই বাড়ী ও তাহার আশপাশ পরিষ্কার রাখা উচিৎ। বাড়ীঘর অপরিষ্কার থাকিলে মশামাছির উপদ্রব হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার রোগও দেখা দেয়। বাড়ীর ঘর-দোর নিয়মিতভাবে ঝাঁট দেওয়া, ধোওয়া ও মোছা উচিৎ। বাড়ীর ভিতরের নর্দমাগুলি প্রতিদিন পরিষ্কার করা উচিৎ। তাহা না হইলে ঐগুলিতে দূষিত পদার্থ জমিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইবে ও বাড়ীর বাতাস দূষিত করিবে। ইহা ছাড়া ময়লা জমিয়া জল নিকাশের উপায় না থাকিলে পচা জলে মশা ডিম পাড়িবে এবং তাহাতে বাড়ীতে মশার উপদ্রব বাড়িবে। বাড়ীর পায়খানা, গোয়ালঘর ইত্যাদি নিয়ম করিয়া পরিষ্কার করা উচিৎ। পায়খানায়

ময়লা নিয়মিত পরিষ্কার হইতেছে কিনা লক্ষ্য না রাখিলে দূষিত গ্যাস উৎপন্ন হইয়া বাড়ীর বাতাসকে দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত করে। ইহা ছাড়া মাছির উৎপাতও বাড়িতে থাকে। গোয়ালঘরও নিয়মিতভাবে ঝাঁটা দিয়া ধোওয়া উচিৎ। বাড়ীর ভিতরের আবর্জনা বাহির করিয়া ফেলিয়া বাড়ী পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখা উচিৎ। শুধু ঝাঁট দিলেই চলিবে না; কতকগুলি স্বাস্থ্যের নিয়ম বাড়ীর প্রত্যেকের মানিয়া চলা কর্তব্য। যেমন, যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলা, প্রস্রাব করা অথবা ছোট ছেলেমেয়েদের উঠানে, রোয়াকে বা ঘরে মলত্যাগ করানর অভ্যাস ইত্যাদি বর্জন করা এবং অন্যেও যাহাতে তাহা করে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

বাড়ীর ভিতর যেরূপ পরিষ্কার রাখা দরকার, বাড়ীর আশপাশও সেইরূপ পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্তব্য। বাড়ীর ভিতরের ময়লা আবর্জনা প্রভৃতি বাইরে ফেলিবার সময় কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলিবার অভ্যাস করা উচিৎ। আঁস্তাকুড় একটিই হইবে, পঞ্চাশটি জায়গা অপরিষ্কার করিলে চলিবে না। শুধু নিজে নয়, পাড়ার প্রত্যেকেই যাহাতে নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলে সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শহরে বাড়ী হইলে উহার বাহিরে যে সরকারী ড্রেন বা নর্দমা আছে, তাহা নিয়মিত পরিষ্কার হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পরিষ্কার না হইলে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে খবর দিয়া পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। গ্রামের বাড়ীর আশেপাশের ঝোপঝাড় নিজেদেরই পরিষ্কার করাইতে হইবে। এইভাবে নিজের বাড়ী ও বাড়ীর আশপাশ পরিষ্কার রাখিলে নিজস্ব স্বাস্থ্য ও জাতীয় স্বাস্থ্য উভয়ই ভালভাবে রক্ষা করা সম্ভবপর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জল সরবরাহ

বাংলা দেশ নদীমাতৃক। সুতরাং নদীর নিকটে যাহারা বাস করে তাহারা সেখান হইতেই প্রধানতঃ জল সংগ্রহ করে। ইহা ব্যতীত পুষ্করিণী কূপ বা নলকূপ হইতেও জল সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশের মফঃস্বলে ও পল্লীগ্রাম অঞ্চলে সাধারণতঃ পুষ্করিণী হইতেই জল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের অজ্ঞ লোকেরা বাসন মাজা, কাপড় কাচা, স্নান করা প্রভৃতি কার্য পুষ্করিণীতেই করে বলিয়া উহার জল সহজেই দূষিত হয়। সেইজন্য পল্লীগ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য সংরক্ষিত পুষ্করিণী থাকা প্রয়োজন। ইহার ব্যবস্থা জলাভূমি, গোরস্থান বা আঁস্তাকুড় হইতে দূরে করা উচিৎ। কেবলমাত্র পানীয় জলের জন্যই এই প্রকার পুকুরটিকে সংরক্ষিত করিতে হইবে। ইহার চারিদিক উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিতে পারিলে ভাল হয়। পুষ্করিণীর পাড়ে কোনরূপ গাছপালা থাকিবে না। কারণ গাছপালা রাখিলে জলে তাহার পাতা পড়িয়া পচিয়া জলকে দূষিত করিবে, অথবা গাছে পাখি বসিয়া জলে মলত্যাগ করিবে। সংরক্ষিত পুষ্করিণীর একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার রাখা উচিৎ। পানীয় জল সংগ্রহের জন্য যাহারা আসিবে তাহারা যাহাতে কোন রকমে জলকে দূষিত করিতে না পারে সেইজন্য সেইখানে একটি মাচা ও কপিকলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জল তুলিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট পাত্রও রাখা উচিৎ যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ মাচার উপর উঠিয়া জল তুলিয়া লইতে পারে। পুকুরে সিঁড়ি যদি না থাকে তাহা হইলে লোকে জলে নামিয়া জল দূষিত করিতে পারিবে না। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে জল দূষিত হইতে

পারেনা। কোন কোন গ্রামে পুষ্করিণী ছাড়া কূপ অথবা নলকূপের সাহায্যে জল সরবরাহ করা হয়। সংরক্ষিত পুষ্করিণীর ন্যায় সংরক্ষিত কূপও পানীয় জলের জন্য রাখিতে পারা যায়। এইরূপ কূপ করিতে হইলে উহা খুব গভীর ভাবে কাটাইতে হইবে ও চারি পাশে ইট ও সিমেণ্টের গাঁথুনি দিতে হইবে। কূপের পাড়ও কোমর পর্যন্ত উঁচু করিতে হইবে। কূপের চারি পাশের খানিকটা জায়গা ঢালু করিয়া সিমেণ্ট দ্বারা বাঁধাইয়া তাহার চারিদিকে জল নিকাশের জন্য পাকা নর্দমা করা উচিৎ! কূপের মুখটিতে জল তুলিবার মত ফাঁক রাখিয়া কেবলমাত্র বাকিটুকু লোহার জালের আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। জল তুলিবার নির্দিষ্ট দড়ি ও পাত্র আলাদা রাখা প্রয়োজন। এইরকম কূপে সময়ে সময়ে পাম্পও লাগাইতে পারা যায়। এইরূপ সংরক্ষিত কূপের কাছে কোনও বড় গাছ থাকিলে চলিবে না, অথবা উহার কাছে কাহাকেও বাসন মাজিতে, কাপড় কাচিতে অথবা স্নান করিতে দেওয়াও চলিবে না। এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কূপের জল আর দূষিত হইবে না। জল কোন প্রকারে দূষিত হইলে তাহাতে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি মিশাইয়া উহার দোষ শোধন করিতে হইবে।

জল শোধন করিবার যে সকল প্রক্রিয়া আছে ফিল্টার করা বা বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছাঁকিয়া লওয়া তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কেবল মাত্র ফিল্টার করিলেই জল জীবাণু শূন্য হয় না, সেই জল ফুটাইয়া ফিল্টার করা উচিৎ। ফিল্টার করিবার জন্য নানা রকমের দেশী ও বিলাতি ফিল্টার-যন্ত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী কলস-ফিল্টার নামক ফিল্টার যন্ত্রটি অল্প খরচে বাড়ীতেই তৈয়ারী করা যায়। এই ফিল্টার-যন্ত্র তৈয়ারী করিতে হইলে একটি কাঠের তিন থাক বিশিষ্ট ফ্রেমে চারিটি কলসী ছবির মত করিয়া বসাইতে হইবে। উপরের

তিনটি কলসীর তলায় খুব ছোট ছিদ্র এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে জল একটি হইতে আর একটিতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জমা হয়। তলার কলসীটি কিন্তু ফুটা হইলে চলিবে না। উপরের কলসীটিতে জল ফুটাইয়া ঢালিতে হইবে। দ্বিতীয় কলসীটির অর্ধেক কাঠ-কয়লা দিয়া ভর্তি থাকিবে এবং তৃতীয়টির অর্ধেক পরিষ্কার মিহি দানার বালি দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। সবার নীচের কলসীটিতে উপরের জল কয়লা ও বালির ভিতর দিয়া পরিষ্কৃত হইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া আসিয়া জমিবে। শেষ কলসী হইতে জল নিত্য ব্যবহারের পাত্রে ঢালিয়া লইতে হইবে। যাহাতে জলে ময়লা না পড়ে সেইজন্য কলসীর মুখ পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।
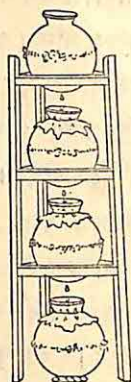
কলস ফিল্টার

আজকাল আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে নলকূপের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু চল্লিশ বৎসর আগে এদেশে একটিও নলকূপ ছিল না।

প্রতি নলকূপের ছাঁকনী, নল, ও পাম্প এই তিনটি অংশ থাকে। নলকূপ খননের সময় অনেকগুলি লোহার নল পর পর জুড়িয়া নানা উপায়ে মাটির ভিতর প্রবেশ করান হয়, এবং শেষ নলটির মাটির দিককার মুখে বালি, মাটি প্রভৃতি আটকাইবার জন্য ছাঁকনি পরান হইয়া থাকে। নলকূপ তৈয়ারী করার পর উহার উপরের নলটির বাহিরের মুখের সহিত পাম্প লাগান হয়। এই পাম্প চালাইয়া মাটির তলা হইতে নল দিয়া জল তোলা হয়। শেষ নলটিতে ছাঁক্‌নী পরান থাকায় জলের সহিত কাদাবালি প্রভৃতি উঠিয়া আসে না। অগভীর ও গভীর এই দুই প্রকার নলকূপই দেখিতে পাওয়া যায়। অগভীর নলকূপের জল সময়ে বিশুদ্ধ হয় না। অনেক সময়ে বাহিরের দূষিত জল মাটি চোয়াইয়া

এই রূপে কূপের জল দূষিত করে। গভীর নলকূপে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়।
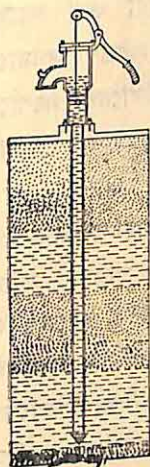
নলকূপের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা অতি উত্তম। জল সোজা নলের ভিতর দিয়া উঠিয়া আসে বলিয়া বাহিরের দূষিত জল বা ধূলা, বালি উহাতে মিশিতে পারে না। বড় বড় গভীর নলকূপের সাহায্যে অনেক শহরে মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

নলকূপ

কোন কোন শহরে নিকটের নদী হইতে পাম্পযোগে জল তুলিয়া বৃহৎ ট্যাঙ্কে ভরা হয় ও কৃত্রিম উপায়ে তাহা পরিশুদ্ধ করিয়া বাড়ী বাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা শহরে এইভাবে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকটে পলতা নামক স্থানে হুগলী নদী হইতে পাম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া বিশুদ্ধ করিয়া নলের সাহায্যে উত্তর কলিকাতার টালা নামক স্থানের বৃহৎ ও উঁচু জলের ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্ছায় পাঠান হয়। এই স্থান হইতে শহরের চারদিকে ভূনিম্নস্থ নলের দ্বারা জল পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ময়লা জল ও মলমূত্র দূরীকরণ

নিজ ব্যবহারের জল নিষ্পত্তির জন্য বাড়ীতে পাকা নর্দমা করা উচিৎ। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ী হইতে এইরূপে জল আসিয়া বাহিরে কোথায় পড়িবে? পল্লীগ্রামে বা ছোট ছোট শহরে ইহার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত

নাই। অবশ্য কয়েকটি বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তার উভয় পাশে নর্দমা কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করে। সুতরাং ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থা আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা। কলিকাতা, বোম্বাই, প্রভৃতি শহরে মাটির নীচ দিয়া নর্দমা তৈয়ারী করা আছে। ইহার সাহায্যে সহরের ময়লা জল নিষ্কাশিত হয়। এইরূপ নর্দমাকে সিউয়ার বলে। ইহাতে মলমূত্রাদিও পড়ে। সিউয়ারের ময়লাকে সিউয়েজ বলে। এই সিউয়েজ কি ভাবে নিষ্পত্তি করা যায় তাহাও একটি প্রধান সমস্যা।

শহরের নিকটবর্তী যদি কোন নদী বা সমুদ্র থাকে তাহা হইলে উহাতে সিউয়েজ ফেলিতে পারা যায়। নদীর স্রোত ও জলের পরিমাণ সমুদ্রে অপেক্ষা কম হওয়ায় সেখানে ফেলিলে তাহার জল দূষিত হয় ও উহা সহজেই মজিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। কলিকাতার সিউয়েজ বিদ্যাধরী নামক নদীতে ফেলার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে ঐ নদী মজিয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতার ময়লা শহরের কয়েক মাইল দূরে ও পূর্বদিকে অবস্থিত বানতলা বলিয়া একটি জায়গায় যন্ত্রের সাহায্যে জল হইতে আলাদা করা হয়। সেই ময়লা দিয়া সার তৈয়ারী হয় এবং বাকি জলটুকু কাটা খাল দিয়া দূরবর্তী কুলটি নদীতে পড়ে। বর্তমানে ময়লা হইতে গ্যাস উৎপাদন করিয়া শহর আলোকিত করার পরিকল্পনা এবং অন্যান্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

পায়খানা—পল্লীগ্রামে মল নিষ্পত্তির উপায় হইল খোলামাঠ অথবা কূয়া-পায়খানা। বেশির ভাগ সময় লোকে মাঠে, বাগানে অথবা পুষ্করিণীর পাড়ে মলত্যাগ করে। প্রাকৃতিক নিয়মে সূর্যকিরণ ও বাতাসের সাহায্যে মলের দোষ নষ্ট হইয়া যায় বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহার পূর্বেই বৃষ্টির জলে মল ধুইয়া পুষ্করিণীর জলে যাইয়া মিশিয়া যায় এবং তাহাকে দূষিত করে।

কূয়া-পায়খানা একটু গভীরভাবে তৈয়ারী করা উচিৎ। তাহা হইলে দুর্গন্ধ উপরে উঠিতে পারে না ও মাছির উপদ্রবও হয় না। সুগভীর কূয়া-পায়খানা করিবার সময়ে মনে রাখা উচিৎ যে, উহার নিকটেই যেন কোন ইঁদারা, কূয়া অথবা পুষ্করিণী না থাকে; যদি থাকে তাহা হইলে পায়খানা হইতে ময়লা চোঁয়াইয়া তাহাদের জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা।

মফঃস্বলের অনেক শহরে খাটা পায়খানা অথবা মলশোধনী পায়খানা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় সাধারণতঃ ড্রেন পায়খানার ব্যবস্থা আছে। খাটা পায়খানা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা না হইলে দুর্গন্ধ বাহির হয়। তাহাতে ঘরে থাকিতে পারা যায় না। মলশোধনী পায়খানা অথবা ড্রেন পায়খানার এই অসুবিধা নাই। ড্রেন পায়খানা ধুইবার জন্য বিশেষ প্রকার জলপাত্রের ব্যবস্থা আছে। তাহার হাতল টানিয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ পায়খানার প্যানের ময়লা জলে ধুইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া যায়।

ড্রেন পায়খানার ব্যবস্থা করিতে হইলে যে দুইটি প্রধান ব্যবস্থা করার প্রয়োজন তাহার একটি হইল ভূগর্ভস্থ "সিউয়ার" ও আর একটি অপর্যাপ্ত জল। জলের তোড়ে সিউয়ার নালা দিয়া মল পায়খানা হইতে নিষ্পত্তি হইবার স্থানে যাইয়া পৌছায়। এই প্রকার পায়খানায় মলত্যাগ করিয়া জল-পাত্রের হাতল টানিয়া দিলেই জল সজোরে মলপাত্র ধুইয়া উহার সংলগ্ন একটি নলের ভিতর পড়ে। এই নলের শেষ প্রান্ত হইতে মাটির ভিতর দিয়া আবার আর একটি নল বাড়ী হইতে রাস্তা পর্যন্ত যায়। প্রতি মল-পাত্রের নীচে ইংরাজী 'S' এর আকারের সাইফন বলিয়া একটি বেঁকান নলের মত অংশ থাকার জন্য খানিকটা জল সব সময়ে তাহার ভিতর থাকিয়া যায়, এইজন্য মলমূত্রের দুর্গন্ধ প্যান হইতে উঠিতে পারে না। নলের ভিতর দিয়া মলমূত্র রাস্তার সিউয়ারে যাইয়া পড়ে। সিউয়ার পরীক্ষা ও পরিষ্কার করিবার জন্য বাড়ীতেও রাস্তার মাঝে মাঝে প্রবেশ দ্বার

বা ম্যানহোল থাকে। রাস্তার জলও রাস্তার দুই পাশের ঝাঁঝরি দিয়া সিউয়ারের ভিতর পড়ে।

মলশোধনী পায়খানা তৈয়ারী করিবার সময়ে একটি দ্বিতল ঘর তৈয়ারী করিতে হয়। ইহার উপরের তলায় সারি সারি পায়খানা যাইবার ব্যবস্থা থাকে। অনেক সময় ড্রেন পায়খানার মত মলশোধনী পায়খানার মলপাত্রও একটি জলপাত্রের সহিত যুক্ত থাকে। মলত্যাগ করিয়া ঐ জলপাত্রটির হাতল টানিয়া দিলে উহা হইতে সজোরে জল বাহির হইয়া মলমূত্রাদি ধুইয়া দেয় এবং অবশেষে নালী দিয়া নীচের তলায়
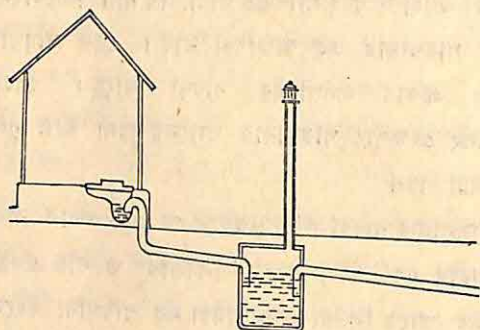
মলশোধনী পায়খানা
এইখানে একটিমাত্র চৌবাচ্ছা দেখান হইয়াছে

চলিয়া যায়। নীচের তলায় চতুর্দিক সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ আলো ও বায়ু চলাচল শূন্য একটি চৌবাচ্চার মত কুঠ্‌রী থাকে। এই বদ্ধ চৌবাচ্ছাটি পাশাপাশি ছোট ও বড় দুইটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করা থাকে। দুইটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে যোগাযোগও থাকে। মলমূত্রাদি প্রথমে ছোট প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে, কিন্তু প্রাচীরের ব্যবধান থাকার জন্য কঠিন মল উপরে ভাসিতে থাকে। অপেক্ষাকৃত তরলাংশ দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে চলিয়া যায়। এই বদ্ধ চৌবাচ্ছায় অবায়ুজীবী জীবাণু সমূহ

থাকে। মলকে তরল করিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে ভাঙ্গা ইহাদের কাজ। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে তরলাকৃতি ঘোলাটে ময়লা জল চৌবাচ্ছা সংলগ্ন নলের সাহায্যে বাহিরে আসিয়া আর একটি খোলা চৌবাচ্ছায় জমা হয়। এই চৌবাচ্ছা ঝামা, কাঁকর ইত্যাদির দ্বারা ভর্তি করা থাকে। সেখানে বায়ুজীবী জীবাণুরাও থাকে। উহারা সূর্য কিরণ ও বাতাসের সাহায্যে তরল ময়লার অ্যামোনিয়া ঘটিত পদার্থ সমূহকে নির্দোষ নাইট্রেট ও নাইট্রাইটে পরিণত করে। এইভাবে পরিশ্রুত হইয়া যে জল বাহির হয় তাহা দুর্গন্ধহীন, জীবাণুশূন্য ও নিরাপদ। উহা কোন ক্ষেতে অথবা জমিতে ছাড়িয়া দিতে পারিলে জমি বেশ সারযুক্ত হয়। মফঃস্বলে যেখানে সিউয়্যারের বন্দোবস্ত নাই সেখানে এইরূপ মলশোধনী পায়খানা করা উচিৎ। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী এবং ইহাতে মেথরের উপর নির্ভর করিতে হয় না।

নবম পরিচ্ছেদ

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্যে প্রধানতঃ ছয়টি উপাদান আছে। উহাদের কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয়, প্রোটিন বা আমিষ জাতীয়, ফ্যাট্ বা স্নেহ বা চর্বি জাতীয়, লবণ, জল এবং ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলে। খাদ্যের দ্বারা আমাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদন প্রভৃতি কার্য হয়।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরে তাপ ও কর্ম শক্তি উৎপাদন করে। প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য দেহের পুষ্টি সাধন করে। ইহা ছাড়া প্রোটিন দ্বারা শরীরের ক্ষয়পূরণ এবং তাপ

উৎপাদনও কিছু পরিমাণে হয়। ফ্যাট্‌ বা স্নেহজাতীয় খাদ্য দৈহিক শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে। লবণ জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহে রক্ত, রস, অস্থি প্রভৃতি গঠন করে ও খাদ্য পরিপাকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ আমাদের দেহে রোগ নিবারণের ক্ষমতা বাড়ায়, কর্মে উৎসাহ আনে, অস্থি ও দন্ত শক্ত করে। ইহারা চক্ষুরোগ নিবারণ করে।

আমাদের দেহে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। শরীরের যাবতীয় আবর্জনা জল দ্বারা মল-মূত্র, ঘর্মের আকারে বাহির হয়। ইহা ব্যতীত রক্তকে তরলও রাখে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। জল দেহের কোষ-গুলিকে সজীব রাখে। জলের অভাবে মানুষ মাত্র সাত দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আমিষ প্রধান খাদ্য হিসাবে আমরা ছানা, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল ইত্যাদি এবং কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল, ময়দা, চিনি, গুড়, ফলমূল, আলু প্রভৃতি গ্রহণ করি। ফ্যাট্‌ অথবা স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ঘি, তেল, মাখন, চর্বি ইত্যাদিই প্রধান। লবণ বহুল খাদ্য হিসাবে শাকসব্জী, ফলমূল, দুধ, ডিম ইত্যাদিকে গণ্য করা হয়। লবণ-এর মধ্যে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ ও আইওডিন এই পাঁচটি পদার্থের লবণ আমরা খাদ্যের সহিত শরীরে গ্রহণ করি। ইহারা আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। টাটকা ফলমূল, শাকসব্জী, ঢেঁকিছাঁটা চাল, ডিম, খাঁটি দুধ এবং টাটকা ও ভেজালবর্জিত সকল প্রকার খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে।

দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়, কারণ দুধের মধ্যে ছয়টি উপাদানই বর্তমান। এইজন্য শিশুর পক্ষে টাটকা খাঁটি দুধই একমাত্র খাদ্য।

কার্যকারিতার তারতম্যে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণকে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ' অথবা 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি', 'ই' প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

খাদ্যপ্রাণ 'ক' বা ভিটামিন 'এ' শিশু ও বালকগণের দেহবৃদ্ধির সহায়তা করে এবং সংক্রামক ব্যাধি ও রাত্রান্ধতা নিবারণ করে। ইহা শরীরের চামড়া মসৃণ রাখে ও সর্দি কাসির ভাব দূর করে। মাঠে চরা পশুর কাঁচা দুধে, মাখনে, মৎস্যলিভার-তৈলে, অঙ্কুরিত শস্যবীজে, শাকের কচি অগ্রভাগে, গাজর, টোমাটো বা বিলাতি বেগুন, কমলা লেবু প্রভৃতি ফলমূলে ও ডিমের কুসুমে 'এ' ভিটামিন পাওয়া যায়। খাদ্যপ্রাণ 'খ' বা ভিটামিন 'বি' বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং নার্ভগুলিকে কর্মক্ষম রাখে। ইহা বেরিবেরিও নিবারণ করে। ঢেঁকি ছাঁটা চাউলে, যাঁতা ভাঙ্গা গমে, মুগ, মটর, ছোলা প্রভৃতি ডালের অঙ্কুরে, পশুপক্ষীর ডিমে, হৃৎপিণ্ডে ও যকৃতে, টোমাটো বা বিলাতি বেগুনে, কমলা লেবুতে ও ভাতের ফেন প্রভৃতিতে ভিটামিন-বি পাওয়া যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'গ' বা ভিটামিন 'সি' আমাদের কর্মে উৎসাহ আনে, স্কার্ভি নামক রোগ প্রতিরোধ করে এবং দেহে চূণ জাতীয় লবণ সঞ্চিত রাখিতে সাহায্য করে।

খাদ্যপ্রাণ 'ঘ' বা ভিটামিট 'ডি' আমাদের দেহের হাড় এবং দাঁতকে দৃঢ় ও সবল রাখে। মাংসপেশীকেও কর্মক্ষম রাখে। এই ভিটামিন চূণ ও ফস্ফরাস ঘটিত লবণের ক্রিয়া বাড়াইয়া দেয়। ক্ষীণ অস্থি বিশিষ্ট বা রিকেট রোগগ্রস্ত শিশুদের পক্ষে এই ভিটামিন অপরিহার্য। 'ডি' ভিটামিন ঘি, মৎস্য-লিভার-তৈল, যকৃত, দুধ, মাখন, ডিমের কুসুম, কাঁচা শাকসব্জি ও সূর্যকিরণে প্রচুর পরিমাণে আছে। খাদ্যপ্রাণ 'ঙ' বা ভিটামিন 'ই' ধান, যব, গম প্রভৃতির অঙ্কুর হইতে নিষ্কাশিত তেলে পাওয়া যায়। এই ভিটামিন মটরশুঁটি, ডিমের কুসুম এবং দুধেও আছে। এই ভিটামিনের অভাবে প্রজনন ক্ষমতা কমিয়া যায়।

খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় সব সময়ে দেখিতে হইবে উহা সুসম খাদ্য হইয়াছে কিনা। অর্থাৎ সেই খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট্ বা

স্নেহপদার্থ, লবণ, জল ও ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ পরিমিত সংখ্যায় আছে কিনা। শুধু তাহাই নহে, সেই খাদ্য হইতে দেহে উপযুক্ত পরিমাণে তাপ পাওয়া যায় কিনা তাহাও দেখিতে হইবে।

মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে খাদ্য হইতে ২,৫০০ হইতে ৩,৬০০ ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোকের ২,১০০ হইতে ২,৮০০ ক্যালোরি হইলেই যথেষ্ট।

সুসম খাদ্য না খাইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। আমরা দৈনিক যে খাদ্য খাই তাহা সুসম নহে। গড়পড়তা বাঙ্গালীর নিত্যকার খাদ্যে ১৪০০ হইতে ১৭০০ ক্যালোরির বেশি তাপ উৎপাদন হয় না। আমরা বেশি ভাত খাই বলিয়া আমাদের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি। কিন্তু মাছ, মাংস বা তেল, ঘি প্রভৃতি কম খাই বলিয়া উহাতে প্রোটিন ও ফ্যাট্ বা স্নেহজাতীয় পদার্থের ভাগ কম থাকে। আমরা কাঁচা তরিতরকারি বা শস্যের অঙ্কুর বা কল প্রায় খাই না বলিয়া আমাদের খাদ্যে ভিটামিনেরও অভাব দেখা যায়। অধিকাংশ সময়েই তরকারির খোসা ফেলিয়া দিয়া থাকি এবং অত্যন্ত বেশি সিদ্ধ করিয়া তরকারি খাই বলিয়া আমরা সেই তরকারির ভিটামিনের ভাগও প্রায় কিছুই পাই না।

প্রশ্নমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। কি কি উপাদান দ্বারা মানব দেহ গঠিত?

২। কোষ, টিস্যু, যন্ত্র ও তন্ত্র কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার তন্ত্রের নাম কর।

৩। ত্বক্, নখ ও কেশ সম্বন্ধে কি জান?

৪। মাংসপেশী কাহাকে বলে? মানবদেহের মাংসপেশীর সংখ্যা কত?

৫। মাংসপেশীর কি কাজ? মানবদেহে ইচ্ছাধীনপেশী ও স্বাধীনপেশী কাহাকে বলে? মাংসপেশীর ধর্ম কি কি?

৬। কণ্ডরা কাহাকে বলে এবং উহা কোথায় থাকে?

৭। হাড় কাহাকে বলে এবং উহার গঠন প্রকৃতি কিরূপ? কয়টি প্রধান ভাগে হাড়কে ভাগ করা যায়?

৮। মজ্জা, উপাস্থি বা তরুণাস্থি, ও সন্ধি বন্ধনী কাহাকে বলে? দুইটি হাড়ের সংযোগস্থল কেন ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না?

৯। পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে কয়টি বিভিন্ন প্রকার হাড় আছে? সমগ্র নর কঙ্কালকে সাধারণতঃ কি কি অংশে ভাগ করা হয়? করোটি কাহাকে বলে ও উহা কি কি দ্বারা গঠিত?

১০। মেরুদণ্ড কাহাকে বলে? উহা কয়ভাগে বিভক্ত? কশেরুকা কিরূপ দেখিতে হয়?

১১। কাঁধের ও বুকের কাঠামোর বর্ণনা দাও।

১২। প্রতি হাতে কি কি অংশ আছে? হাতের বিভিন্ন অংশে কয়টি করিয়া হাড় থাকে?

১৩। শ্রোণিচক্রের বর্ণনা দাও।

১৪। প্রতি পায়ে কি কি অংশ আছে? পায়ের বিভিন্ন অংশে কয়টি করিয়া হাড় থাকে?

১৫। পাচন তন্ত্র কাহাকে বলে? উহার বিভিন্ন প্রধান অংশের নাম ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১৬। পৌষ্টিক নালীর প্রথম ভাগে কি কি অংশ আছে?

১৭। মুখ গহ্বর, জিহ্বা, দাঁত, লালাগ্রন্থি ও অধিজিহ্বা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১৮। পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের কার্য কি?

১৯। কি উপায়ে খাদ্য গ্রহণের পর খাদ্যদ্রব্য হইতে জীর্ণ ও পরিপাক হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে? খাদ্যের অসারাংশের পরিণতি কি?

২০। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় কাহাকে বলে? উহাদের কি কি কার্য?

২১। মানব দেহের রক্ত-সঞ্চালনতন্ত্র কিভাবে গঠিত হয়?

২২। শিরা ও ধমনীর কাজ কি? জালক কাহাকে বলে?

২৩। হৃৎপিণ্ডের আকৃতি কিরূপ? হৃৎপিণ্ডের গঠন বৈচিত্র্য বর্ণনা কর।

২৪। অলিন্দ, নিলয়, কপাটিকা, ঊর্ধ্ব মহাশিরা, নিম্ন মহাশিরা, করোনারি সাইনাস, করোনারি ধমনী ও মহাধমনী কাহাকে বলে?

২৫। হৃৎস্পন্দন কাহাকে বলে? সুস্থ দেহ ও অসুস্থ দেহের হৃৎস্পন্দনের প্রভেদ কি? নাড়ী দেখা কাহাকে বলে? অনিয়মিত ধমনী স্পন্দন কাহাকে বলে?

২৬। মানব দেহে রক্ত কিভাবে সঞ্চালিত হয়?

২৭। অক্সিজেন ও খাদ্যের সার পদার্থ কিরূপে দেহের প্রতি কোষে পৌছায় এবং কিরূপে আবার দেহকোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কোষমল দেহ হইতে বহির্গত হয় তাহার বর্ণনা দাও।

২৮। বৃহত্তর রক্তসঞ্চালন প্রণালী, ক্ষুদ্রতর রক্তসঞ্চালন প্রণালী

ও করোনারি রক্ত সঞ্চালন প্রণালী কাহাকে বলে? উহাদের কার্যাবলীর বর্ণনা দাও।

২৯। রক্ত ও রক্তের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩০। রক্তরসে কি কি দ্রব্য মিশ্রিত থাকে? কি প্রক্রিয়ায় রক্তপাত বন্ধ হয়? শরীরের কোনস্থান কাটিয়া রক্তপাত হইতে থাকিলে কি সাধারণ উপায়ে তাহা বন্ধ করা যাইতে পারে?

৩১। শ্বাসতন্ত্র কাহাকে বলে? মানব দেহের শ্বাসতন্ত্র কি কি দ্বারা গঠিত?

৩২। প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করা কাহাকে বলে? কি উপায়ে শ্বাস কার্য সম্পাদিত হয়?

৩৩। গলবিল, আলজিহ্বা, টনসিল, অধিজিহ্বা, শ্বাসনালিকা বা ব্রঙ্কাস, ও ব্রঙ্কিঅল কাহাকে বলে?

৩৪। টনসিল পাকে কেন? বিষম লাগার কারণ কি?

৩৫। স্বরযন্ত্রটি কিরূপে গঠিত? স্বরের উৎপত্তি কিরূপে হয়?

৩৬। ফুসফুস কিরূপ দেখিতে ও উহার কার্য কি? প্লুরুসি কাহাকে বলে?

৩৭। নার্ভতন্ত্র কাহাকে বলে। মানব দেহের নার্ভতন্ত্র কি কি দ্বারা গঠিত।

৩৮। নার্ভকোষ, নার্ভকেন্দ্র, নার্ভগণ্ড বা নার্ভগ্রন্থি, অ্যাক্সন ও ও ডেনড্রাইট্ কাহাকে বলে?

৩৯। নার্ভকোষের আকৃতি বর্ণনা কর।

৪০। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের নাম কি? মহামস্তিষ্কের আকৃতি বর্ণনা কর।

৪১। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর।

৪২। সুষুম্না-কাণ্ড কি? উহা কি কি কার্য করে?

৪৩। নার্ভ কি ও কয় প্রকার? নার্ভের কার্য কি? মস্তিষ্কের নার্ভ ও সুষুম্না-কাণ্ডের নার্ভের প্রভেদ কি?

৪৪। কেন্দ্রাভিমুখী বা অন্তর্মুখী নার্ভপথ ও কেন্দ্রাপসারী বা বহির্মুখী নার্ভপথ কাহাকে বলে এবং তাহাদের কার্য কি?

৪৫। কিরূপে মানব দেহে খবর আদান প্রদান চলে?

৪৬। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া কাহাকে বলে? উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

৪৭। স্বতন্ত্র নার্ভমণ্ডল কাহাকে বলে?

৪৮। রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্র কাহাকে বলে? কি করিয়া দেহ হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যতীত অন্যান্য দূষিত পদার্থগুলি বহির্গত হয়?

৪৯। চিত্রসহ চামড়ার ছেদের বর্ণনা দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৫০। আমাদের অদৃশ্য শত্রু কাহারা? তাহারা আমাদের কি কি ক্ষতি করে?

৫১। জীবাণু কি? কয়প্রকার জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়? অবায়ুজীবি ও বায়ুজীবি জীবাণু কাহাদের বলে? কাহার দ্বারা জীবাণু আবিষ্কৃত হয়?

৫২। অনাক্রম্যতা কি? কি করিয়া জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা হইল?

৫৩। টীকা কি? ডাঃ জেনার কি নূতন প্রথা প্রবর্তন করেন?

৫৪। ইনোকুলেশন ও ভ্যাক্সিনেশনের মধ্যে প্রভেদ কি? ভ্যাক্সিন লিম্ফ কাহাকে বলে?

৫৫। বসন্তের টীকা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আর কোন কোন রোগের টীকা আবিষ্কৃত হয়? বসন্তের টীকা ও কলেরা, টাইফয়েড,

নিউমোনিয়া প্রভৃতির টীকার মধ্যে প্রভেদ কি? বি, সি, জি কাহাকে বলে?

৫৬। সিরাম কাহাকে বলে? ভ্যাক্‌সিন ও সিরামের মধ্যে প্রভেদ কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫৭। ম্যালেরিয়া ব্যাধির কারণ কি?

৫৮। ম্যালেরিয়া ব্যাধির জীবাণু কি প্রকার? জীবাণুর 'মানব চক্র' ও মশক চক্রের বর্ণনা দাও।

৫৯। কোন শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়া ব্যাধির বাহক? কি করিয়া এক ব্যক্তি হইতে আর এক ব্যক্তির দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে?

৬০। মশা কি উপায়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু এক দেহ হইতে আর এক দেহে সংক্রামিত করে। মশার রক্ত চুষিবার প্রণালীটি বর্ণনা কর।

৬১। ম্যালেরিয়ার জীবাণু কয় প্রকার? কে সর্বপ্রথমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন? মশার দ্বারা ম্যালেরিয়ার জীবাণু এক দেহ হইতে আর এক দেহে সংক্রামিত হয় এবং স্ত্রী মশার দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জীবনেতিহাসের শেষ অধ্যায় সম্পূর্ণ হয় এই সত্য কে আবিষ্কার করেন?

৬২। বিভিন্ন প্রকার মশা হইতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বাহক মশা চিনিবার উপায় সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬৩। ম্যালেরিয়া ব্যাধির লক্ষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬৪। কলেরা ব্যাধির কারণ কি? কি করিয়া এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়? কলেরার প্রাদুর্ভাব কখন খুব বেশি হয়?

৬৫। কলেরার লক্ষণ কি কি? কি করিয়া এই ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়?

৬৬। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় কি করা প্রয়োজন?

৬৭। টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বরের কারণ কি? কি করিয়া এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়? টাইফয়েডের স্থিতিকাল ও এই ব্যাধির উপসর্গগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬৮। কি কি লক্ষণ দেখিয়া টাইফয়েড হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়? টাইফয়েড রোগীর শুশ্রূষা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। প্যারা টাইফয়েড কাহাকে বলে?

৬৯। টাইফয়েডের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কি কি করা প্রয়োজন?

৭০। বসন্ত রোগ কয় প্রকারের হয়। তাহাদের প্রভেদ কি? কি করিয়া বসন্ত রোগের বিস্তার হয়? বসন্ত রোগ আমাদের কি ক্ষতি করে?

৭১। বসন্ত রোগের লক্ষণ কি? বসন্ত হইলে কি কি করা কর্তব্য? বসন্ত রোগের চিকিৎসা কি?

৭২। বসন্তের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিৎ?

৭৩। আমাশয় কয় প্রকারের? আমাশয় রোগের লক্ষণ কি? কি করিয়া আমাশয় রোগ সংক্রামিত হয়?

৭৪। কি উপায়ে আমাশয় হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা যায়? আমাশয় হইলে কি চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিৎ?

৭৫। আমাশয় নিবারণের উপায় কি?

৭৬। খোস ও পাঁচড়া কেন হয়? খোস ও পাঁচড়ার প্রতিকার কি?

৭৭। কি করিয়া ক্ষয়রোগের প্রসার হয়? যক্ষা কাহাকে বলে?

৭৮। যক্ষারোগের লক্ষণ কি? যক্ষারোগের কি চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিৎ?

৭৯। যক্ষারোগের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে ও যক্ষার প্রসার রোধ করিতে হইলে কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৮০। কাপড়ে আগুণ লাগিলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন?

৮১। আগুণে পোড়ার চিকিৎসা কি?

৮২। জলে ডোবা ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়?

৮৩। কি করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য সম্পাদন করিতে হয়?

৮৪। পতনের ফলে আমাদের কি কি ক্ষতি হইতে পারে? অযথা পতনের হাত হইতে কি করিলে রক্ষা পাওয়া যায়?

৮৫। কেহ পড়িয়া যাইলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ?

৮৬। গুরুতর পতনের ফলে কাহারও অবস্থা সাংঘাতিক হইলে কি প্রাথমিক প্রতিবিধান অবলম্বন করা প্রয়োজন?

৮৭। কাঁকড়া বিছা কামড়াইলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়?

৮৮। বোলতার কামড়ের প্রতিকার কি?

৮৯। সাধারণ কুকুর কামড়াইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ?

৯০। কি লক্ষণ দেখিয়া কুকুর পাগল হইয়াছে বোঝা যায়?

৯১। জলাতঙ্ক রোগ কি করিয়া হয়? এই রোগের পরিণাম কি? কোন চিকিৎসা জলাতঙ্ক রোগীর পক্ষে উপযোগী।

৯২। পাগলা কুকুর অথবা রাস্তার অপরিচিত কুকুর কামড়াইলে কি করিতে হয় ?

৯৩। সাপে কামড়াইলে প্রথমেই কি করা প্রয়োজন ? দাঁতের দাগ দেখিয়া কি করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে দংশনকারী সাপটি বিষধর কি নির্বিষ ?

৯৪। বিষধর সাপের দাঁত কিরূপ ? কি প্রকারে দংশিত ব্যক্তির দেহে বিষ প্রবেশ করে ?

৯৫। বিষধর সাপ কামড়াইলে দংশিত ব্যক্তির দেহে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় ?

৯৬। সাপের কামড়ের চিকিৎসা কি ?

৯৭। কি করিয়া ক্ষতস্থান দিয়া রক্তস্রাব হয় ? রক্তস্রাব কয় প্রকারের ? রক্তস্রাবে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ ?

৯৮। প্যাড চাপা দিয়া কি উপায়ে রক্তস্রাব বন্ধ করা যায় ? কি করিয়া টর্ণিকেট প্রয়োগ করিতে হয় ? ধামণিক রক্তস্রাব ও শৈরিক রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিৎ ?

৯৯। রক্ত বন্ধ হইলে ক্ষত দূষিত হওয়া নিবারনার্থে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১০০। ব্যায়াম কি ? কেন ব্যায়াম করা উচিৎ ? নিয়মিত ব্যায়াম করিলে কি কি উপকার পাওয়া যায় ?

১০১। কয়েকটি উপযোগী ব্যায়ামের নাম কর। ছেলে ও মেয়েদের কোন কোন প্রকার ব্যায়াম করা উচিৎ ? পরিণত বয়সের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম কি ?

১০২। অনিয়মিত ব্যায়াম, উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ বিনা ব্যায়াম করা, অতিরিক্ত ব্যায়াম প্রভৃতির কুফল কি ?

১০৩। নিয়মিত ব্যায়ামকারীর পক্ষে কি কি পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১০৪। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীতা কি ?

১০৫। দাঁত মাজা ও চুল আঁচড়ান কেন ঠিকমত করিতে হয়? দাঁত মাজিবার নিয়ম কি ? কেন নখ ছোট করিয়া কাটা উচিৎ ?

১০৬। কেন নিয়মিত কাপড় জামা কাচা ও বিছানাপত্র পরিস্কার করা উচিৎ ? প্রতিদিন নিয়মিত মলত্যাগ করিলে কি সুফল লাভ করা যায় ?

১০৭। বাড়ী ও তাহার আশপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিৎ কেন ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১০৮। বাংলাদেশের মফঃস্বল সহর ও পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কি উপায়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জলের চাহিদা মিটান হইয়া থাকে ?

১০৯। সংরক্ষিত পুষ্করিণী ও সংরক্ষিত কূপের প্রয়োজনীয়তা কি ? কি উপায়ে সংরক্ষিত পুষ্করিণী ও কূপ সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ? পুষ্করিণী বা কূপ দূষিত হইলে কি উপায়ে উহাকে শোধন করা যায় ?

১১০। ফিল্টার কাহাকে বলে ? সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী একটি ফিল্টারের বর্ণনা দাও ?

১১১। নলকূপ কাহাকে বলে ? কয়প্রকার নলকূপ দেখিতে পাওয়া যায় ? নলকূপে কি কি অংশ থাকে ? নলকূপের উপকারিতা কি ?

১১২। সাধারণ বড় সহরে কি উপায়ে জল সরবরাহ করা হয় ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১১৩। কি উপায়ে পল্লীগ্রামে ও ছোট সহরে ময়লা জল নিকাশ করা যাইতে পারে? বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি সহরে কি উপায়ে ময়লা জল নিকাশ করা হইয়া থাকে?

১১৪। কি কি উপায়ে মল নিকাশ করা যায়? খাটা পায়খানা, কূয়া পায়খানা, মলশোধনী পায়খানা ও ড্রেন পায়খানার প্রভেদ কি?

১১৫। ড্রেন পায়খানার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন?

১১৬। মলশোধনী পায়খানার বর্ণনা দাও। এই প্রকার পায়খানায় কি উপায়ে মল শোধিত হয়? ইহার উপকারিতা কি?

নবম পরিচ্ছেদ

১১৭। আমাদের খাদ্যে কি কি উপাদান আছে? বিভিন্ন উপাদানের কার্য কি?

১১৮। ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা কি? কয়প্রকার ভিটামিন আছে? কোন কোন দ্রব্য হইতে আমরা বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন পাইয়া থাকি?

১১৯। খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি? সুসম খাদ্য কাহাকে বলে? পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে কত ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন?

১২০। সুসম খাদ্যের অভাবে আমাদের আমাদের কি কি ক্ষতি হইতে পারে? কেন আমাদের খাদ্যে ভিটামিনের ভাগ কম থাকে?

১২১। সাধারণ শিশুর উপযোগী শ্রেষ্ঠ খাদ্য কি? কেন এই খাদ্যকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়? রিকেট রোগগ্রস্ত শিশুদের পক্ষে অপরিহার্য কোন কোন খাদ্য?